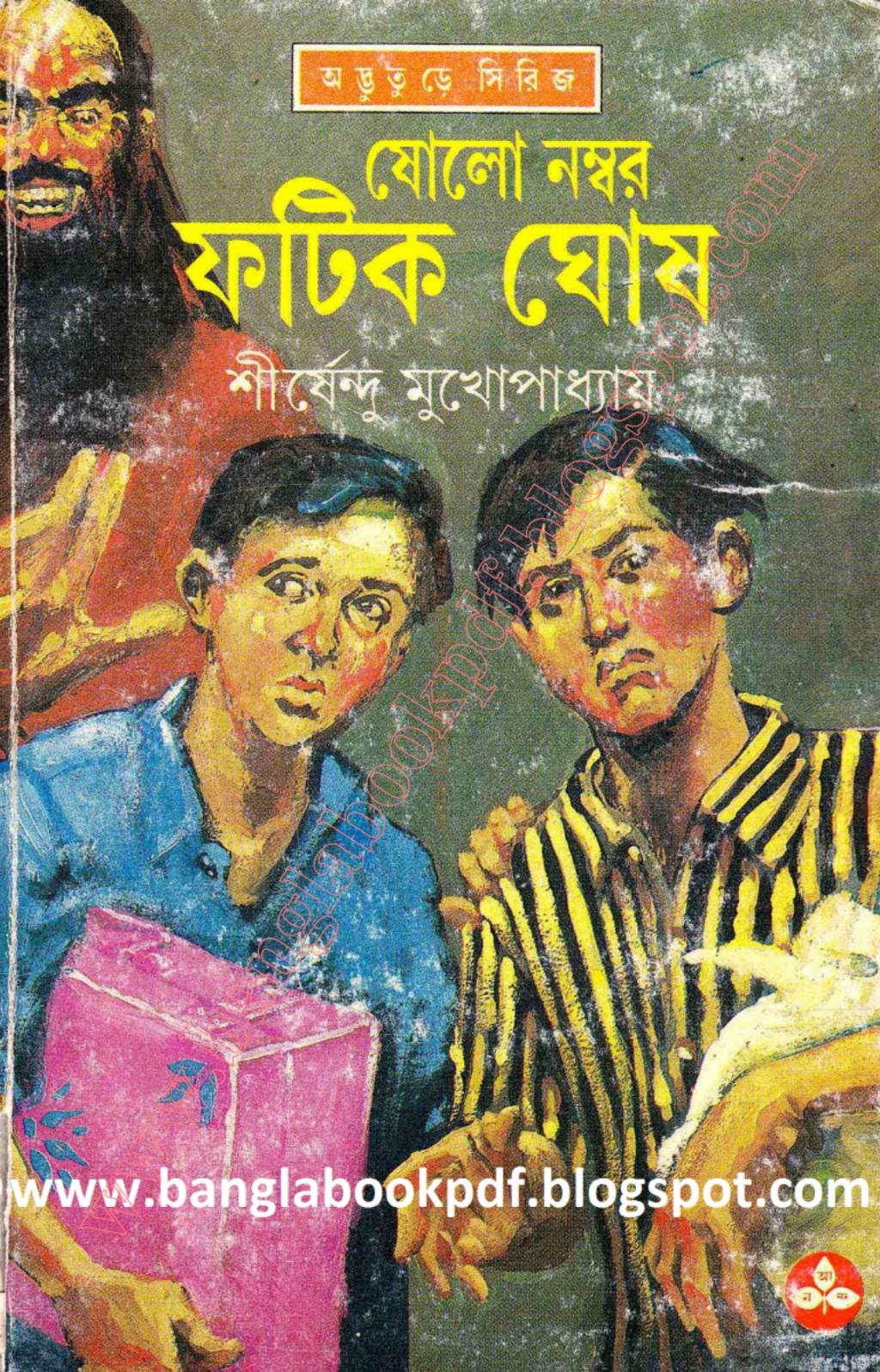


অ ডু ত ডে সি রিজ

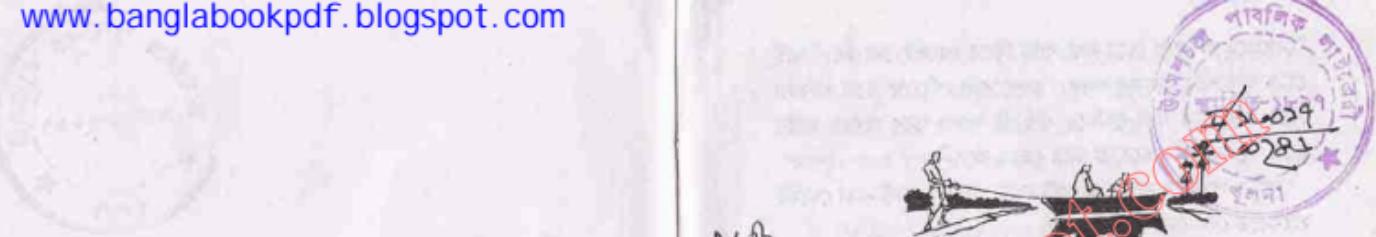
যোলো নম্বর ফটিক ঘোষ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়



www.banglابookpdf.blogspot.com





রাসপুরের খালের ধারে অনেক হমকাল ফটিক। খালের ওপর
একখানা জরাজীর্ণ বাঁশের সাকে। পেছনে নিতাই। ফটিক তার দিকে
ফিরে বলল, “ও নিতাই, হয়ে গেল।”

“হলটা কী?”

“এই সাকে পেরোতে হলে হনুমান হতে হয়। অবস্থা দেখছিস।”
বাস্তুরিক সাকের অবস্থা খুবই কাহিল। পেরনোর জন্য দুধানা বাঁশ
পাতা আছে। বাঁশে একটা বাঁশের রেলিং। কিন্তু পেতে রাখা বাঁশের
একখানা মাঝখানে মচাত হয়ে বুলছে। রেলিংয়ের বাঁশ কেতুরে
আছে। নীচে শেষ বর্ষার জলে খাল টাইটসুর। বেশ সোতও আছে।

ফটিক দমে গেলেও নিতাই সবসময়েই আশাবাদী। বলল, “চল,
পেরনোর চেষ্টা তো করি। জলে পড়ে গেলে সাঁত্রে চলে যাব।”

“কী বুদ্ধি তোর! আমি কি সীতার জানি নাকি? তার ওপর তিনের
সুটকেস আর পেঁতুলা রয়েছে সঙ্গে, জলে পড়লে সব নষ্ট।”

আশাবাদী নিতাই এবার চিন্তায় পড়ল। খালটা পেরনো শক্তই
বটে। বেশি বড় নয়, হাত পনেরো চওড়া খাল। কিন্তু লাফ দিয়ে তো
আর ডিঙোনো যায় না। রাসপুরের লোকজনের কাছে তারা পথের
হাদিস জানতে চেয়েছিল। তারা দোগেছে যাবে শুনে লোকগুলো
প্রথমটায় এমন ভাব করল যেন নামটাই কখনও শোনেনি। একজন
বলল, “দোগেছে! সেখানে কেউ যায়!” আর একজন বলল,

For More Bangla E-Books
www.banglabookpdf.blogspot.com



“দোগেছে যাওয়ার চেয়ে বরং বাড়ি ফিরে দেলেই তো হয়।” যাই হোক অবশ্যে একজন বলল, “বেলাবেলি পৌছতে হলে বটতলা দিয়ে রাসপুরের খাল পেরিয়ে যাওয়াই ভাল। তবে কাজটা কঠিন হবে।” কেন কঠিন হবে তা আর ভেঙে বলেনি।

ফটিক পা দিয়ে সাঁকেটা একটু নেড়ে দেখল। একটু নাড়া দেয়েই সাঁকেতে যেন চেউ থেলে গেল।

ফটিক পিছিয়ে এসে বলল, “অসম্ভব।”

নিতাই মৃদুভাবে বলে, “একটু চেষ্টা করে দেখলে হয়। ব্যালাঙ্গটা কিক রাখতে পারলে পেরোনো যায়।”

থালের ওপারে একটা বটগোছ। তার ছায়ায় একটা লোক উন্মুহয়ে বসে ছিল। এবার উঠে এগিয়ে এসে বলল, “কী খোকারা, খাল পেরোবে নাকি?”

নিতাই বলল, “হ্যাঁ। কিন্তু কী করে পেরোব?”

“কেন, শুই তো সাঁকো। সবাই পেরোচ্ছ।”

“পেরোচ্ছ! পড়ে যায় না?”

“তা দু-চারটে পড়ে। আজ সকালে হর ডাঙ্গার আর বন্দাবন কর্মকার পড়ল। দুপুরে পড়ল নব মণ্ডল, সীতারাম কাহার আর তজ দাস। বরাতজোর থাকলে পেরিয়েও যায় কেউ কেউ।”

“না মশাই, আমরা ঝুঁকি নিতে পারব না। সঙ্গে জিনিসপত্র আছে। আচ্ছা, থালে জল কত?”

লোকটা মোলায়েম গলায় বলে, “বাধা না, বড়জোর ছসাত হাত হবে। সাঁতার দিয়েও আসতে পারো। তবে—” বলে লোকটা থেমে গেল।

নিতাই বলল, “তবে কী? জলে কুমিরাটুমির আছে নাকি?”

লোকটা অভয় দিয়ে বলল, “আরে না। এইটুকুন থালে কি আর কুমির থাকে? তবে দু-চারটে ঘড়িয়াল আর কামট আছে বটে। তা

তারা তো আর তোমাদের খেয়ে ফেলতে পারবে না। বড়জোর হাত বা পায়ের দু-চারটে আঙুল কেটে নেবে, কিংবা ধরে পেট বা পায়ের ডিম থেকে এক খাবলা করে মাসে। অনেকের ওপর দেরিই যাবে অবশ্য। আজ সকালেই হরবাবুর ডান পায়ের বুজে আঙুলটা দেল কিনা।”

ফটিক ফ্যাকাসে মুখে বলল, “বলে কী রে লোকটা!”

লোকটা বলল, “জৈব আর সাপের কথা তো ধরছিই না হৈ বাপু। রাসপুরের খাল পেরোতে হলে অসব হিসেবে করলে কি চলে?”

নিতাই বলল, “আনা কোনও উপায় নেই পেরোনোর?”

“তা ধাককে না কেন? আড়াই মাইল উত্তরে গেলে উজ্জবপুরে দেৱাঘাটের বাবহা আছে। আরও এক মাইল উজিয়ে হরিমাধবপুরে পাকা পোল পাবে।”

“তাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। আমরা অনেক দূর থেকে আসছি, বেলাবেলি এক জয়গায় পৌছতে হবে। একটা উপায় হয় না?”

লোকটা খুব চিন্তিত মুখে বলল, “দাঁড়াও বাপু, দাঁড়াও। উপায় ভাবতে তো একটু সময় দেবে। পরের ভাবনা ভাবতে ভাবতেই আমার সময় চলে যায়, নিজের ভাবনা আর ভাবার মুসসতই হয় না।”

“একটু তাড়াতাড়ি ভাবলে ভাল হয়। আমাদের খিদেও পেরেছে কিনা।”

লোকটা খাঁক করে উঠল, “ওঁ, খিদে তেষ্টা যেন শুধু ওদেরই পায়! আমার পায় না নাকি? ওরে বাপু, খিদে-তেষ্টা পায় বলেই তো জগতের এত সমস্যা। তা তোমাদের কাছে কি শুটিপাঁচেক টাকা হবে।”

ফটিক আশায় আশায় বলল, “তা হবে।”

“বাঃ, বেশ! তা হলে বাঁ ধারে বিশ পা হাঁটে ওই যে ঝোপঝাড় দেখছ, ওখানে গিয়ে মাড়িগুৰি।”

ঝোপঝাড়ের দিকে চেয়ে ফটিক সন্ধিহান গলায় বলল, “সাপটাপ নেই তো!”

লোকটা নিরুদ্ধে গলায় বলল, “তা থাকবে না কেন? বর্ষার সময় এখনই তো তারা বেরোয়। আছেও নানারকম। গেছো সাপ, মেছো সাপ, কালকেউটে, গোখরো, চিতি, বোঢ়া। কত চাই?”

“ও বাবা।”

“আহা, অত ভাবলে কি চলে! সাপেদেরও নানা বিষয়কর্ম আছে। শুধু মানুষকে কামড়ে বেড়ালেই তো তাদের চলে না। পেটের ধান্দায় ঘুরে বেড়াতে হয়। একাঁচু দেখেশুনে পা ফেলো, তা হলেই হবে।”

নিতাই বলল, “চল তো, অত ভয় পেলে কাজ হয় না।”

অগত্যা দু'জনে শুটিগুটি গিয়ে ঝোপঝাড়ে ঢুকল। কাঁটা গাছ, বিছুটি কেনেণ্টাই অভাব নেই।

চেক লুঙ্গি আর সবুজ জামা পরা বৈঁটে লোকটা জলের ধারে এসে খেঁটায় বাঁধা একটা দড়ি ধারে টান দিতেই দড়িটা জল থেকে উঠে এল আর দেখা গেল, দড়ির একটা প্রান্ত এপাশে একটা ছেঁট মৌকের সঙ্গে বাঁধা। ঝোপঝাড়ের ভেতর লুকোনো ছেঁট বলে মৌকেটা দেখা যাইছিল না।

“নাও হে, উঠে পড়ো। পরের উপরাক করতে করতে গতরে কালি পড়ে গেল।”

ফটিক আর নিতাই আর দেখি করল না। জলের ধারে নেমে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে করে উঠে গত্তেল। লোকটা দড়িটা টেনে লহমায় তাদের খালের প্রশারে নিয়ে ফেলল।

লোকটা ভাকগাল হেসে বলল, “তায়েবগঞ্জের হাটে যাবে বুকি? তা আর শক্ত কী? ওই ডান ধারের রাস্তা ধরে শুটিগুটি চলে যাও,

মাইল দুই গোলেই খয়রা নদীর ধারে বিরাটি হাট। জিনিসপত্র বেজায় শত্তা। আটাশপুরের বিখ্যাত বেজন, গঙ্গারামপুরের নামকরা খিঁড়ে, সাহাপুরের কুমড়ো, তার ওপর নয়ন ময়রার জিবেগোজা তো আছেই।”

ফটিক বলল, “না মশাই, আমরা তায়েবগঞ্জের হাটে যাব না। অন্যদিকে যাব।”

লোকটা হাঠাঁ তেরিঙ্গা হয়ে বলল, “কেন, তায়েবগঞ্জের হাটটা কি কিছু খারাপ ভাইয়া নাকি? কত জজ ব্যারিস্টার ও হাট দেখতে আসে তো তামরা তো কোথাকার পুঁকে ছেকুরা। এখন পাঁচটা টাকা ছাড়ে দেবে, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।”

নিতাই ফস করে বলে উঠল, “খেয়াপারের জন্য পাঁচ টাকা ভাড়া নিছেন। এ তো দিনে ভাকাতি। ওই পুঁকে খাল পেরোনোর ভাড়া মাথাপিছু পঁচিশ পয়সা হলোই অনেক।”

লোকটা অবাক হয়ে বলল, “খেয়াপারের ভাড়া চাইছি কে বলল? ছিঃ ছিঃ, ওইসব ছেটখাটো কাজ করে বেড়াই বলে ভাবলে নাকি? এই মহাদেব দাস ছুঁচো মেনে হাত গুর্জ করে না হো।”

“তবে পাঁচ টাকা নিলেন যে।”

“সেটা তো আমার মাথার দাম। এই যে তোমরা খাল পেরোতে পারিছিলে না বলে আমাকে ধরে বসলো, আমাকে মাথা খাটিতে হল, বুকি বের করতে হল, এর দাম কি চান আনা আট আনা? মহাদেব দাসকে কি খেয়ার মার্কি পেরেছ নাকি? এ-তল্লাটে সবাই আমাকে বুদ্ধিজীবী বলে জানে, বুবালে! টাকটা ছাড়ো।”

বিদেশ-বিভুই বলে কথা, তার ওপর লোকটা ও বদমেজাজি দেখে আর কথা না বাড়িয়ে ফটিক পাঁচটা টাকা দিয়ে দিল।

মহাদেব দাস টাকটা আমার পকেটে রেখে একাঁচু নরম গলায়

বলল, “না গেলে না যাবে, তবু বলছি তামোরগঞ্জের হাটটাও কিন্তু কিছু খারাপ জায়গা ছিল না। নবন ময়রার জিবেগজা পছন্দ না হলে সাতকড়ির বেগুনি তো রয়েছে। খাটি সর্বের তেলে ভাজা, ওপরে পোক ঢানো, চিজুতোর সাইজ। তা বলে বেশি খেলে চলবে না, পেটে জায়গা রেখে খেতে হবে। ধরো, দখখানা করে খেবে তারপর গিয়ে বসলৈ রায়েমশাইয়ের মঙ্গা দোকানে। ইয়া বড় বড় মঙ্গা। বেগুনির পরই মঙ্গা খেতে যেন অসূচ। তাও যেতে ইচ্ছে করছে না!”

ফটিক কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, “খুবই ইচ্ছে করছে, কিন্তু আমাদের উপায় নেই। সঙ্গের মধ্যে এক জায়গায় পৌছতেই হবে।”

মহাদেব একটু হতাশ হয়ে বলল, “তা যাবে কোথা? কুলতলি নাকি? সেও ভাল জায়গা। আজ সেখানে বেটিমদের মালসাভোগ আর দর্থিকর্দম হচ্ছে। এই তো সোজা নাক বরাবর হেঁটে গেলে ঘটাখানেকের রাঙ্গা। তা কুলতলিকে কি তোমাদের মামাবাড়ি?”

ফটিক মাথা নেড়ে বলে, “কুলতলি নয়, আমরা যাব দেগোছে।”

মহাদেব দাস খানিকক্ষণ হাঁ করে অবাক চোখে ঢেয়ে থেকে বলল, “কী বললৈ?”

“গাঁরের নাম দেগোছে।”

মহাদেব ঘন ঘন ডাইনে বাঁয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, “নাঃ, আমার কান দুটোই গেছে। বুঁচির মাও সেদিন বলছিল বেটে, ওগো বুঁচির বাগ, তুমি কিন্তু আজকাল কান শুভ্র ধান শুনছ। একবার কান দুটো শৃশ্র ভাঙ্গারে ন্য দেখাবেই চলছে না।”

নিতাই আর ফটিক মুখ-তাকাতাকি করল। দেগোছের নামটা অবধি অনেকের সহ্য হচ্ছে না দেখে তাদের একটু ভয়-ভয়ই করতে লাগল।

এবার নিতাই এগিয়ে এসে বলল, “আচ্ছা মহাদেবদাদা,

দেগোছের নাম শুনলেই সবাই চমকাছে কেন বলতে পারেন?”

মহাদেব দাস একটু দম ধরে থেকে বিস্ত মুখে বলল, “চমকানোর আর দোষ কী বলো খোকারা! দেগোছে যাওয়া আর গ্রাণ্টা যদের কাছে বক্স রাখা একই জিনিস। না হে বাপু, আমি বৰং এইবেলা রাখনা হয়ে পড়ি।”

নিতাই তাড়াতাড়ি পথ আটকে বলল, “না মহাদেবদাদা, তা হচ্ছে না। ব্যাপারটা একটু খোলনা করে বলতে হবে।”

মহাদেব দাস বটতলার খালের ওপর ধপ করে বসে পড়ল। তারপর বলল, “উদ্বেগাস! সে বড় ভয়ঙ্কর জায়গা হে। না গেলেই ন্য!”

ফটিক মাথা নেড়ে বলল, “না গিয়ে উপায় নেই। আমার এক পিসি সেখানে থাকে। জয়ে তাকে দেখিনি কখনও। সেই পিসি চিঠি লিখে যেতে বলেছে। খুব নাকি দরকার।”

চোখ বড় বড় করে মহাদেব বলল, “পিসি! দেগোছেতে কারও পিসি থাকে বলে শুনিনি। তা পিসেমশাইয়ের নামটি কী?”

“শ্রীনটবর রায়।”

নামটা শুনেই মহাদেবের চোখদুটো বড় বড় হয়ে গেল। ঘন ঘন ডাইনে বাঁয়ে মাথা নেড়ে সে বলল, “না, না, আমি কিছুই বলতে চাই না।”

ফটিক উদ্বিগ্ন হয়ে জিজেস করল, “কেন, তিনি কি খারাপ লোক?”

মহাদেব একটু শাশ্বা হয়ে বলল, “তাই বললুম বুঝি! নটবর রায়ের নাম তো জীবনে এই প্রথম শুলাম রে!”

ফটিক আর নিতাই একটু চোখ-তাকাতাকি করে নিল। মহাদেব কিছু ঢেপে যাচ্ছে।

নিতাই নিরাহ গলায় বলল, “দেখ মহাদেবদাদা, আমরা ভিন

গায়ের লোক, এদিকে কথনও আসিন। দেশেছে কেমন জায়গা
একটু খোল্সা করে বললে আমাদের সুবিধে হয়।”

মহাদেব উদাস গলায় বলল, “জায়গা খারাপ হবে কেন? পিসির
বাড়ি বলে কথা। গেলেই হয়। তবে মাইলটাক শিয়ে হারিপুরের
জঙ্গল পড়বে পথে। শুইটে পেরোতে পারলে গন ডাইনির জঙ্গল।
তারপর কাপালিকের অষ্টভূজা মন্দির। সেখানে এখনও নরবলি হয়।
মন্দিরের পর মস্ত বাঁশবন। বাঁশবনের পর করানেশ্বরীর খাল। খাল
পেরিয়ে দোগেছে। বাঁ দিকে নাক বরাবর রাখনা হয়ে পড়ে। সাঁক
বরাবর পৌছে যাবি, যদি না—”

বলে মহাদেব খেমে গেল।

ফটিক ঝুকে পড়ে বলল, “যদি না—কী গো মহাদেবদাদা?”

মহাদেব মাথাটাথা চুলকে বলল, “আমার মৃশকিল কী জিনিস?
পেটে কথা থাকে না। কথা চাপতে গেলে পেটে এমন বায়ু হয় যে,
তখন সামনে এক হাড়ি রসগোঢ়া রাখলেও সেন্দিকে তাকাতে ইচ্ছে
করে না।”

নিতাই বলল, “বায়ু হওয়া মোটেই ভাল নয়। কথা চেপে রাখব
দুরকারটাই বা কী?”

“তা না হয় বলছি। আগে দুটো টাকা দে। কুরারত তো একটা
দাম আছে।”

নিতাই অবাক হয়ে বলে, “এই যে পাঁচটা টাকা নিলে!”

“সে তো মগজের দাম। কথা দাম আলাদা। ডাঙুরের যেমন
ভিজিট, উকিলের যেমন ফি, তেমনই মহাদেব দাস বুজিজীবীর
কথারও একটু দাম আছে বে।”

গেল আত্ম দুটো টাকা। মহাদেব টাকাটা পকেটে চালান করে
বলল, “হারিপুরের জঙ্গলে গাছে গাছে মেলা হনুমান দেখতে পাবি।
তা বলে হনুমান নয় কিন্তু। ও হচ্ছে কালু ডাকাতের আস্তান। তার

শাগরেদেরা গাছে বুলে ওত পেতে থাকে। যেই জঙ্গলে সৈধোবি
অমনই বুপ বুপ করে লাফিয়ে নেমে যিনে কেলাবে হাতে দা,
চাবি, বজ্জম।”

“ওরে বাবা!”

“সর্বৰ খুয়ের জঙ্গল যেই পেরোবি অমনই গনা ডাইনি খোলা
গলায় ডাক দেবে, “কেঁ যায় যে? আর বাবা, ফলার যেয়ে যা।”

“বটে!”

“যদি বাঁ দিবে তাকাস তা হলেই হয়ে গেল। জঙ্গল মধ্যে টেনে
নিয়ে পাঁকে পুতে দেবে কেলাবে। নয়তো গোরু ডেকা বানিয়ে রেখে
দেবে। চোখ কান বুজে মাঝাখানের সরু পথটা পেরিয়ে শিয়ে পড়বি
হার কাপালিকের অষ্টভূজা মন্দিরের চতুরে। নথরকাষ্টি ছেলেপুলে
দেশেলেই হারের চেলারা বাপাবাপ ধরে পিছমোড়া করে বেবে
পাতালঘরে কেলে রাখবে। অমাবস্যার রাতে খুব ধূমধাম করে
মাঘের সামনে বলি হয়ে যাবি।”

ফটিক বলল, “তা হলে কি ফিরে যাব?”

মহাদেব মোলায়েম গলায় বলে, “আহা, ফিরে যাওয়ার কথা
উঠছে কেন? এসব বিপদ আপদ পেরিয়েও তো কেউ কেউ
দোগেছে যায়, না কি? তা মন্দির পেরিয়ে বাঁশবন। সে নিষিদ্ধ
বাঁশবন, দিনে দুপুরেও ঘূরঘূঢ়ি অন্ধকার। ওই বাঁশবনে বেকলা যাবৎ
দুটি কবক বাস করে আসছে। উটকো মানুষ চুকলে ভারী বুশি হয়।
তারা লোক খারাপ নয়, তবে তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ হাড়-তু খেলতে
হবে। তা তাদের হাত থেকে ছাড়া পেলে থাকছে শুধু করানেশ্বরীর
খাল। তা সে খাল পেরোনো শুভ হবে। রাসপুরের খালে কুমির না
থাকলেও করানেশ্বরীর খালে তারা গিজগিজ করবে। তাদের পেটে
রাবণের খিদে। হী করেই আছে। আর সে এমন বড় হী যে, জাহাজ
অবধি সৈধোয়ে যাব।”

ফটিক উদ্ধিষ্ঠ হয়ে বলে, “তা হলে পেরোব কী করে?”

“তা করালেখৰীর খালও পেরোনো যায়। কেউ কেউ তো পেরোব যে বাগু। মানছি, সবাই পেরোতে পারে না, দু-দশজন কুমিৰের পেটেও যায়। তা বলে তোৱা পারবি না কেন?”

ফটিক বলে, “বেৱা নেই?”

“সেও ছিল একসময়। মোট সাতজন মাঝি নৌকোসমেত কুমিৰের পেটে যাওয়ায় ও পাট উঠে গেছে। দোগেছের লোকেৱা খালের দু'ধাৰে দুটো উভাৗছে আড়া করে দড়ি বৈধে দিয়েছে। গাছে উঠে ওই দড়িতে ঝুল খেয়ে খেয়ে পেরোতে হয়। কেন্দো কয়েকটা হৃষ্মান ওই সময়ে এসে যদি কাতুকুতু না দেয় বা মাথায় চাঁচি না দাবে, আৱ নাচে উপোসী কুমিৰের হাঁ দেখে যদি তোদেৱ হাত পা হিম হয়ে না যাব তা হলে দিবি পেরিয়ে যাবি। পেরিয়ে গিয়ে অবশ্য—”

ফটিক সভয়ে জিজেস কৰল, “অবশ্য?”

মহাদেৱ একটা দীৰ্ঘাস ফেলে বলল, “বলে আৱ কী হবে? দোগেছে পৌছে তো তোৱা নটবৰ রাঙোৱ খল্লৱেই পড়ে যাচ্ছিস তাৰপৰ যে কী হবে কে জানে!”

ফটিক শুকনো মুখে নিতাইয়ের দিকে ফিরে বলল, “কী কৰব রে নিতাই? এ যা শুনছি তাতে তো কিৱে যাওয়াই ডাঙ মনে হচ্ছে।”

মহাদেৱ বলল, “এসেই যখন পড়েছিস পিলিস শৰ্কি যাবি চলে তখন না হয়—”

ফটিক মাথা নেড়ে বলল, “বা মহাদেবদাদা, দোগেছে শিরে আৱ কাজ নেই। আমোৱা বৰং বেলাৰেল ক্ষেত্ৰপথে রওনা হয়ে পড়ি।”

মহাদেৱ উদাস শৰ্কায় বলল, “তা যাবি তো ফিরেই যা, পৈতৃক প্রাণ্টা তা হলে এ যাইয়া বেঁচে গেল। চ, তোদেৱ খালটা পার করে দিই।”

নিতাই এবাৰ বলে উঠল, “আমাদেৱ কাছে কিন্তু আৱ পয়সা নেই।”

মহাদেৱ হেনে বলল, “পৱেৱ জনা কৱি বলে আমাৰ আৱ এ জনে পয়সা হল না বৈ। ঠিক আছে বাগু, বিনামগনাই পাৱ কৱে দিষ্টি, দুধেৰ ছেলেৱা ভালয় ভালয় বিশে গেলেই হল। দেখি, চিঠিখানা দেখি।”

ফটিক অৱাক হয়ে বলল, “কীসেৱ চিঠি?”

মহাদেৱ বলল, “কেন? এই যে বললি পিসি তোকে চিঠি দিয়ে আসতে বলেছে।”

ফটিক পৰোক্ত থেকে পোস্টকাৰ্ডটা দেৱ কৱে দিতেই ভু কুচকে মহাদেৱ বলল, “এ তো জাল জিনিস মনে হচ্ছে। কেউ তোদেৱ ফৌলে ফেলাৰ চেষ্টা কৱেছে। চিঠিটা আমাৰ কাছে থাক, ব্যাপারটা বুৰো দেখতে হবে।”

এই বলে মহাদেৱ চিঠিটা পকেটে পুৰে ফেলল।

মহাদেৱ দাসেৱ নৌকোৱ উঠে দু'ভানে ফেৱ খালেৱ এপাৱে চলে এল। ফটিক তাড়াতড়ি নেমে পড়ে বলল, “পা চালিয়ে চল নিতাই।”

নিতাই ঝোপৰাঢ়েৰ আড়ালে একটু আড়াল হয়েই বলল, “দাড়া।”

“কী হল?”

নিতাই আড়াল থেকে উকি মেৰে দেখল, মহাদেৱ দাস এদিকে একটু চেয়ে থেকে দাঁড়িয়ে রাইল। তাৰপৰ বেশ খুশি-খুশি মুখ কৱে পিছু ফিরে তান দিকেৱ রাস্তা ধৰে হলহন কৱে হাওয়া হয়ে গোল।

নিতাই ফটিকেৱ হাত ধৰে টেনে বলল, “আয়, আমোৱা দোগেছে যাৰ।”

“বলিস কী? শুনলি না কী সাঙ্গৰাতিক জায়গা!”

“তোর মাথা। লোকটাকে আমার একটুও বিশ্বাস হয়নি। আয় তো, একটা উটকে লোকের কথা শুনে এত ঘাবড় যাওয়ার কী আছে? এতই যদি খারাপ জায়গা তা হলে তোর পিসি কি তোকে সেখানে ডেকে পাঠাত?”

ফটিক ভিত্ত মানুষ। তবু নিতাইয়ের কথাটা একটু ভেবে দেখে বলল, “তা অবশ্য ঠিক, তবে—”

“তবে টবে নয়। আয় তো, যা হওয়ার হবে।”

দু'জনে ফের মহাদেবের মৌকোয় উঠে খাল পেরিয়ে বাঁ দিকের রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল।

ফটিক বলল, “মহাদেব লোকটা কোথায় গেল বল তো!”

নিতাই বলল, “শুলি না তায়েবগঞ্জের হাটের কথা। এখন গিয়ে আমাদের পয়সাও সেখানে ভালম্ব থাবে।”

সান্ত-সাতো ঢাকার দুঃখে ফটিকের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। সে বলল, “পিসির চিঠিটাও তো লোকটা নিয়ে গেল।”

নিতাই বলল, “তুই দিতে গেলি কেন?”

ফটিক মুখ ছুন করে বলল, “লোকটা যে বলল জাল চিটি! কেউ আমাদের ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে!”

“ওকে বিশ্বাস করাটা ঠিক হয়নি।”

“যাকগে, চিটি তো আর তেমন বিছু নয়। আইনি তো যাচ্ছি।”



হরিপুরের জঙ্গলে পৌছতে বেশি সময় লাগল না। বিকেলের শুরুতেই পৌছে গেল তারা।

ফটিক একটু ইতস্তত করে বলল, “চুকব রে নিতাই?”

“না ঢাকলে জঙ্গল পারোবি কী করে? আয় তো।”

জঙ্গল খুব একটা ঘন নয়। ভেতরে দিয়ি একটা শুড়িপথ ঝুঁকে বেঁচে চলে গেছে। দু'জনে ঢুকে পড়ল।

নির্বিশেষই হাটছিল তারা। কন্টা যেখানে একটু ঘন হয়ে এল সেখানে একটা মস্ত গাছ। গাছের তলায় পা দিতেই হঠাৎ সামনে ঝুপ করে কে একটা লাফিয়ে নামল। দু'জনে চমকে উঠে ভয় খেয়ে ধমকে দাঁড়াল। লাফ-দেওয়া লোকটার পরানে খাটো মালকোঠা মারা ধূতি, গায়ে একটা বেনিয়ান, মুঠো লাল একটা গামছায় ঢাকা, হাতে একবানা ছেঁবা। লোকটা উবু হয়ে বসে তাদের দিকে ঝুলছুল করে চেয়ে দেখছিল। হঠাৎ একটু কিকিয়ে উঠে বলল, “উঃ, মাজাটা গেছে বাপ! এই বয়সে কি আর লাফ-ধূতি সব? বলি হাঁ করে দেখিস কী আহায়কেরা? ধরে একটু তুলবি তো!”

নিতাই আর ফটিক চোখাচোখি করে নিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে লোকটাকে দাঁড় করাল। লোকটা নিতাই ছেটখাটো, বয়সও সতরের ওপর। নিতাই বলল, “এই জঙ্গলের মধ্যে ছেরা নিয়ে কী করছিলেন?”

লোকটা মুখ বিকৃত করে বলল, “শুষ্ঠির পিণ্ডি চটকাছিলাম রে বাপ! নে, আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই, সঙ্গে যা আছে সব দিয়ে

এখন মানে মানে কেটে পড়।”

নিতাই আবাক হয়ে বলল, “তার মানে! আপনি কি ডাকাত
নাকি?”

মুখের গামছাটা সরিয়ে লোকটা থিচিয়ে উঠল, “ডাকাত না তো
কী? সঙ্গ নাকি?”

নিতাই হেসে ফেলে বলল, “আমাদের কাছে কিছু নেই। আমরা
দুজনেই গরিব মানুষ।”

লোকটা ভারী হতাশ হয়ে গামছা দিয়ে মুখ মুছে বলল, “সবাই
যদি ওই কথা বলে তা হলে আমার চলে কীসে বলতে পারিস?
যাকেই ধরি সেই বলে, কিছু নেই, আমরা গরিব। আবার কেউ বলে,
পরে দিয়ে যাব। ওরে বাবা, চুরি-ডাকাতিতে কি আর ধারবাকি
চলে? এ হল নগদ-নগদির কারবার।”

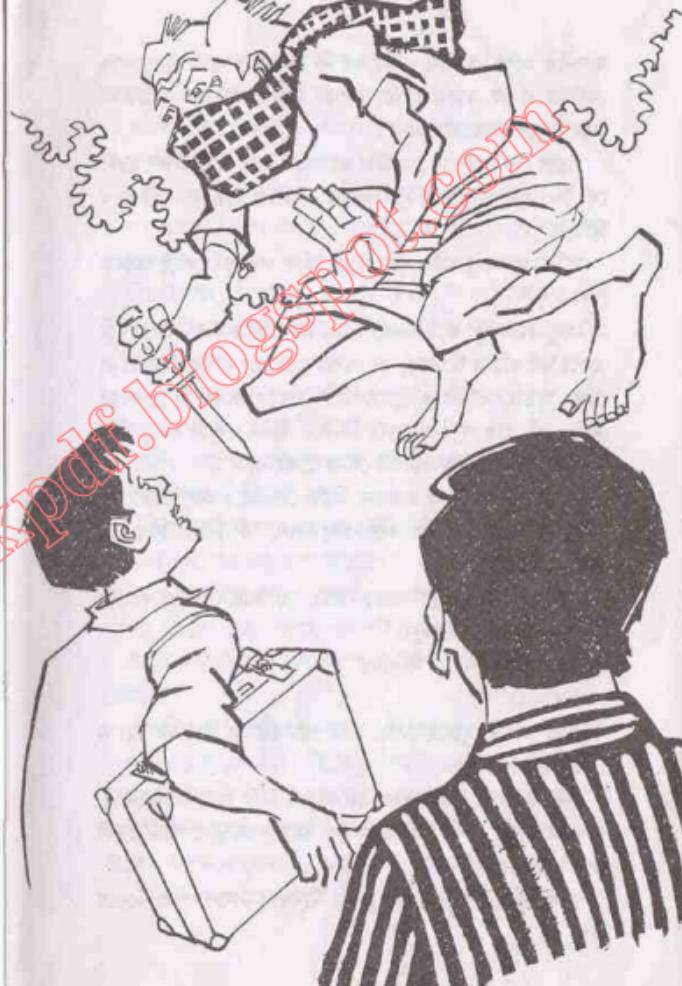
ফটিক হাঁ করে লোকটাকে দেখছিল। এবার সাহস করে বলল,
“আপনাই কি কালু ডাকাত?”

রোগা লোকটা বুক চিতিয়ে বলল, “তবে?”

“তা আপনাকে তো একা দেখছি! আপনার শাগরেদরা সব
কোথায়?”

কালু ডাকাত ভারী বিরক্ত হয়ে মুখখালা বিবৃত করে বলল,
“তাদের কথা আর বলিসনি। বুড়ো হয়ে কয়েকজন মরেছে, যারা
আছে তাদের কতক ঘরগেরহালি ঢায়বাস নিয়ে আছে, কতক
আবার বুড়ো বয়সে ধৰ্মকথা নিয়ে মেজে আছে। তাদের অধঃপতন
দেখলে চোখের জল চাপতে পরবে না। আমি এখন একাই এই
হরিপুরের জঙ্গল সামলাবিং। তা আবক্ষে সেসব দুঃখের কথা। সঙ্গে
একশো দুশো যা আছ দিয়ে ফেল তো, তারপর হালকা হয়ে
যেখানে যাচ্ছি চলে যা। গায়ে অঁচড়টি পড়বে না।”

নিতাই জিজি কেটে বলল, “ছিঃ ছিঃ, কী যে বলেন কালু ওসাদ!



আপনার মতো মান্যগণ ডাকাতের কি আমাদের মতো এলেবেলে
লোকের ওপর ঢাঁও হওয়া শোভা পায়! আমাদের বেচলেও
একশো দুশো টাকা হবে না।”

“তবে তো মুশকিলে ফেললি। আজ এখন অবধি বউনিটাই হয়নি
যে! বিশ পঞ্চাশটা টাকা হয় কিনা বাজপ্যাটিয়া হাতড়ে একটু দেখ
দিকি বাপু!” www.banglabookpdf.blogspot.com

ফটিক মুখখানা মনিন করে বলে, “বিশ পঞ্চাশ! সে যে অনেক
টাকা দানু!”

কালু করণ মুখ করে বলল, “আজ মনসাপোতায় হাটবার। গিয়ি
একটা কর্ম ধরিয়ে দিয়েছে। তা সেবন আর হবে না দেখছি। তা না
হোক, অস্তত বউনিটা করিয়ে দে তো বাপ। পাঁচ দশ যা হোক দে
দিকি। এই হাত বাড়িয়ে মুঠো ফিরিয়ে রাখছি। ঝুঁটো মেরে হাত
গঙ্গাই হচ্ছে বটে, কিন্তু বউনিটা যে না হলেই নয়।”

নিতাই টাক থেকে একখানা সিকি বের করে কালু ডাকাতের
হাতে দিতেই হাতটা মঁটো করে কালু বলল, “কী দিলি? কিছু তো
টেরই পাছি না।”

নিতাই ভারী লাজুক গলায় বলল, “ও আর দেখবার দরকার
নেই। পকেটে পুরে ফেলুন।”

“কিছু দিয়েছিস তো সত্তিই?”

“দিয়েছি।”

কালু চোখ না খুলেই বলল, “বড় ছোট জিনিস দিয়েছিস রে। এ
কি সিকি নাকি?”

নিতাই বলল, “আর লজ্জা দেবেন না। সিকি ছেট জিনিস বটে,
কিন্তু আমাদের কাছে সিকিও অনেক পয়সা। আপনার বউনি হয়নি
বলেই দেওয়া।”

কালু সিকিয়া পকেটে পুরে একটা দীর্ঘশাস ফেলে বলল, “দেশে
২২

এত গরিব কোথেকে আসছে বল তো! গরিবে গরিবে যে গাঁ-গঞ্জ
ভরে গেল! এ তো মোটেই ভাল লক্ষণ নয়।”

ফটিক বলল, “আজে, দেশের খুবই দুরবস্থা। এবার আমাদের
ছেড়ে দিন, অনেকদূরে যাব।”

কালু ডাকাত ফের গাছে উঠতে উঠতে বলল, “যাবি তো যা।
তবে লোককে সিকির কথাটা বলিন না। তা হলে ওটাই রেট ধরে
নেবে সবাই।”

নিতাই বলে, “আজেনা। এসব গুহ্য কথা কি কেউ ফাঁস করে?”

কালু ডাকাতের হাত থেকে নিঞ্চল পেয়ে দুঁজনে তাড়াতড়ি
হাততে লাগল।

জঙ্গল পেরিয়েই একটা ফাঁকা জায়গা। বাঁ ধারে নাবাল জমি,
ডানে ধনবেত। মাঝখান দিয়ে রাস্তা।

ফটিক একটু ভয়-ঘাওয়া গলায় বলল, “এটাই কি গনা ডাইনির
জলা নাকি রে নিতাই?”

নিতাই জবাব দেওয়ার আগেই বাঁ ধার থেকে থোনা সুরে
জবাবটা এল, “হ্যা গো ভালমানুষের পো, এটাই গনা ডাইনির জলা।
তা তোমরা দুটিতে চললে কোথায়? আহ রে, মুখ যে একেবারে
শুকিয়ে গোছে! আয় বাচারা, বনে দুটি ফলার যেয়ে যা।”

ফটিক চমকে উঠে বলল, “বাপ রে! বাঁ ধারে তাকাস না নিতাই,
দোড়ো।”

নিতাই কিছু সাহসী। সে বলল, “নাঁড়া না, রগড়টা দেখেই যাই।”

ফটিক দোড়ে পালাল বটে, কিন্তু নিতাই পালাল না। সে বাঁ ধারে
চেয়ে দেখল, একখানা খোড়ো ঘরের সামনে একজন খুনখুনে বৃঢ়ি
লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের চালে দিয়ি লাউডগা
উঠেছে, ফল্স গাছগাছাদি, কলার ঝাড়ও দেখা যাচ্ছে।

নিতাই হেঁকে বলল, “তা কী খাওয়াবে গো ঠাকুমাৎ আমাদের

২৩

বজ্জ খিদে পেয়েছে।”

বৃক্ষ বী হাত তুলে লম্বা লম্বা আঙুলে হাতছানি দিয়ে বলল, “আব বাছা আয়! কত খাবি যেয়ে যা।”

নিতাইরের বুকটা একটু দূরদূর করল বটে, তবে সে এগিয়েও গেল। এত খিদে পেয়েছে যে, ফলারের লোভ সামলানো মুশ্কিল। সামনে দিব্যি নিকোনো উঠোন। উঠোনের মাঝখানে একখানা কদম গাছ। চারদিকে গোর, ছাগল, ভেড়া, কুকুর, বেড়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নিতাই বলল, “তা আপনিই কি গনা ডাইনি ঠাকুরা?”

“তাই তো সবাই বলে রে বাগ, ভয়ে কেউ ধারেকাছে আসে না।”

“তা লোকে ডয়াই বা পায় কেন?”

গনা ডাইনি দুঃখ করে বলল, “খামোখা ভয় পায় বাগ, খামোখা ভয় পায়। চেয়ে দেখ দিকি, কাউকে কি আমি খারাপ রেখেছি! ওই যে দেখছিস ধাতি ছাগলটা, ও হল নবজ্ঞামের পটু নষ্টর। এক নম্বরের সুন্দরো, ছাঁচড়া, পাজি লোক। দেখ তো এখন কেমন দিব্যি আছে। ঘাসপাতা থার, চৰায় বৰায় ঘুরে বেড়ায়। আর ওই যে গোকুটা দেখছিস, ছাই-ছাই রঞ্জ, ও হল গোবিন্দপুরের অতলী মণ্ডল। এমন বাগভুটে ছিল যে, পাড়ার লোক তিঠোতে পারত না। ওর স্বামীটা সাধু হয়ে হিমালয়ে চলে গেছে। এখন দ্যাখ তো, অতলী কেমন ধীরস্থিতি ঠাণ্ডা মেরে গেছে। সাত চড়ে রা কাঢ়বে না। আর ওই কেলে কুকুরটা কে বল তো! ও হল চৰগঞ্জের হারিদেৱ দাস। সবাই বলত, খুনে হরিপদ। কত খুনখারাপি যে ক্ষেত্ৰেছে তাৰ হিসেব নেই। এখন দ্যাখ, কেমন মিলেমিশে আছে স্বার সঙ্গে। কাৰণও খারাপ কিছু কৰেছি কি, তুই-ই বল। আৱ ওই জলায় যাদেৱ পুঁতে রেখেছি তাৰেও তো প্রাপ্ত মারিনি রে বাপু। ওই দ্যাখ, গদাই নষ্টৰ কেমন চুৰি কৰা ছেড়ে বুকুন গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছে। ওই যে শিমুলগাছটা দেখছিস ও হল হাড়কেঞ্চ গণেশ হাওলাদাৰ। আৱ ওই

যে দেখছিস...”

নিতাইরের মাথাটা বিমর্শ কৰলিল, ধপ কৰে কদমগাছটাৰ তলায় বসে পড়ে চোখ বুজে ফেলল। অতি-সাহস দেখাতে দিয়ে বজ্জ ভুল কৰে ফেলেছে তা বুবাতে পাৰছে হাতে হাড়ে। কিন্তু এখন হাত পা এমন অবশ যে, পালানোৰ শক্তি নেই।

গনা ডাইনি খলখল কৰে হেসে বলল, “মুছো গোলি নাকি বাপ? তা ভয়টা কীসেৱ? তোৱ জন্ম আমি খুব ভাল ব্যবস্থা কৰেছি। মন্ত্ৰৰ পড়ে এই ধূলোপজ্ঞা যেই গায়ে ছুড়ে মাৰব সেই তুই একটা চনমনে টগবগে সাদা ঘোড়া হয়ে যাবি। ঘোড়া হওয়া কি খারাপ বল! সাদা ঘোড়াৰ দেমাকুঠি আলাদা।”

নিতাই আধৰোজা চোখে চেয়ে দেখল, গনা ডাইনি উঠোন থেকে একমুঠো ধূলো তুলে নিয়ে বিড়াবিড় কৰে মঞ্চ পড়েছে। নিতাই অবশ শৰীৰে বসে ঘোড়া হওয়াৰ বিধিৰ অসুবিধেৰ কথা ভেবে নিছিল। প্ৰথম অসুবিধে, ঘোড়া হলে তাৰ চাৰটে পা গজাবে বটে কিন্তু হাত দুটো গায়েৰ হয়ে যাবে। হাত না থাকলে জৰাপড়া কৰা যাবে না, একটু ছবি আঁকাৰ শৰ্ক ছিল তাৰ, তা সেটাৰও বারোটা বাজল, কালী নদীৰ কাছে তৰঙার মহড়া নিছিল, তাৱে হয়ে গেল। উপৰতু হাত দিয়ে মেঝে ভাতেৰ গৱাস মুখে তোলাৰ ভুলতে হবে। ঘাসপাতা থেকে কেমন লাগে সে জানে না। ওসব তাৰ সইবে কি? পোক চচড়ি, পোড়েৰ ভাজা, মুগেৰ ডাল বা মাছেৰ বোলেৰ কথাৰ ভুলতে হবে। অসুবিধে আৱও আছে। সে শুনেছে ঘোড়াৰ দাঁড়িয়ে ঘূমোয়ানি, এখন পেৱে উঠবে কী?”

গনা ডাইনি মঞ্চ পড়া শেষ কৰে মুঠোভৰ ধূলো তাৰ গায়ে ছুড়ে মেৰে একগাল হেসে বলল, “নে বাগ, একাৰ ঘোড়া হয়ে আনন্দে থাক। কোনও বায় বামেলা আৱ রইল না।”

নিতাই টি হি হি বলে একটা ডাক ছেড়ে গোসাড়া দিয়ে ঘোর চেষ্টা করল। ঘোড়া হয়ে তার অন্যরকম কিছু লাগছে না তো! নিজেকে এখনও নিতাই-নিতাই বলেই মনে হচ্ছে যে!

গনা ডাইনি গোল গোল চোখ করে তাকে দেখছিল। এবার ভারী হতাশ হয়ে মাথা নেড়ে বলল, “নাঃ, মন্তরে কাজ হচ্ছে না তো! আর হবেই বা কী করে? পাঁচ কুড়ি সাত বক্ষর বৰস হল বাপ, মাথাটার কি কিছু আছে! সব কেমন ভুল হয়ে যায়। অর্ধেক মন্ত্র বলার পর কেমন যেন তুলুনি এসে পড়ে, তারপর আর বাকি মন্ত্রটা মনেই পড়ে না। মাথাটা বেভুল হয়ে পড়েছে বজ্জ!”

নিতাই গোসাড়া দিয়ে বসল। তার ভয়াড়র কেটে গেছে। সে বেশ চেঁচিয়েই বলে উঠল, “তা বললে হবে কেন ঠাকুরা? আমার যে অনেকদিন ধরে ঘোড়া হওয়ার বজ্জ শখ! আপনি ঘোড়া বানিয়ে দেবেন বলে কত আশা করে বসে ছিলাম। কিন্তু এ তো দেখছি জোচুরি! অ্যায়! এ যে দিনে ডাকাতি! এ যে সাজাতিক লোকস্থানো কারবার!”

গনা ডাইনি আকুল হয়ে বলল, “ওরে চুপ! চুপ! লোকে শুনতে পেলে যে গনা ডাইনির বাজার নষ্ট হবে! চুপ কর ভাই, যা চাস দেব!”

নিতাই মাথা নেড়ে বলল, “না না, আমি কিছু জাইন, আমি শুধু ঘোড়া হতে চাই। ঘোড়া হব বলে সেই কতুর হেকে আসা! এত নামডাক শুনেছিলুম আপনার, এখন তো দেখছি পুরোটাই ফাঁকিবাজি!”

“চেচসনি বাপ, চেচসনি। সেকে শুনলে দুয়ো দেবে যে আমাকে! তা কী খাবি বাপ, বল তো! ভাল চিড়ে, মুড়িকি, বোলা শুড়, পাকা কাঁচাল আর তালের বড়া হলে হবে? সঙ্গে বিচেকলাও দেবইনা!”

নিতাই একটু নরম হয়ে বলল, “এ তো নাকের বদলে নরম হল গো ঠাকুরা! তা কী আর করা যাবে, তাই আনুন দেছি!”

ওদিকে ফটিক পালালেও বেশিদূর যায়নি। নিতাই সাজে না দেখে সেও গুটিখুটি ফিরে এল। তারপর আড়াল থেকে উকি মেরে দেখল, নিতাই কদমগাছের তলায় পিণ্ডিতে বসে বিবাট ফপার সাটাছে। যিদে ফটিকেরও পেয়েছে সুতৰাং ভয়াড়র ঝেড়ে ফেলে সেও গিয়ে নিতাইয়ের পাশে বসে পড়ল।

গনা ডাইনি ঘর থেকে বিচেকলা নিয়ে বেরিয়ে এসে ফটিককে দেখে বলল, “ওয়াহ এ আবার কে রে?”

নিতাই একটু হেসে বলল, “আমিও একটু-আধটু মন্ত্র জানি গো ঠাকুরা! তোমার ধাড়ি ছাগলটাকে মন্ত্র দিয়ে পটু নক্ষন বানিয়ে দিয়েছি হেরা। দাও, উকেও ফলার দাও। আহা বেচারা কতকাল ধাসপাতা খেয়ে আছে!”

গনা ডাইনি উচ্চবাচ্য না করে ফটিককেও দিল।

খুব খেল দুঁজনে। খেয়ে খেয়ে টান হয়ে গেল। তারপর জল খেয়ে উঠে পড়ল, “চলি গো ঠাকুরা!”

গনা ডাইনি বলল, “আয় বাছা, আজকের বৃত্তান্তটা যেন পাঁচকান করিসনি।”

“পাগল! এসব গুহ্য কথা কি কাউকে বলতে হবে?”

রাস্তায় এসে হাঁটিতে হাঁটিতে ফটিক বলল, “তোর কি দুর্জয় সাহস? ডাইনির ডেরায় কোন সাহসে চুকলি, যদি পাঁকে পুঁতে ফেলত বা গোরু ভেড়া করে দিত?”

“ধূস! গোরু ভেড়া হতে যাব কেন? আমি একটা সাদা ঘোড়া হয়ে যাচ্ছিলাম। সেসব কথা পরে হবে। ওই দ্যাখ, অটভুজার মন্দির!”

ফটিক বলল, “ওখানে আর দাঁড়ানোর দরকার নেই। চল দৌড়ে

পেরিয়ে যাই।”

নিতাইয়ের এখন সাহস খুব বেড়ে গেছে। বলল, “পালা কেন? সব দেখেশুনে দোওয়া ভাল, অভিজ্ঞতায় জ্ঞান বাঢ়ো।”

অষ্টভূজার মন্দির হেসেখেলে এক-দেড়শো বছরের পুরনো হবে। চারদিকে মস্ত মস্ত বটগাছ। বটের ঝুরি নেমে জায়গাটা এই বিকলেবেলাতেও অক্ষরকার করে রেখেছে। মন্দিরের চতুরে চুক্তেই তারা শুনতে পেল একটা শুরুগঞ্জীর গলা মন্দিরের ভেতর থেকে বলছে, “মা! মা! নররক্ত চাই মা করালবাদনী? নরবলি চাস মা? আজ আমাৰস্বার রাতেই নরবলি দেব মা!”

ফটিকের মুখ শুকিয়ে গেল। কাঁপা গলায় বলল, “শুনছিস?”

নিতাই বলল, “শুনছি, কিন্তু তার খাস নে। লোকটাকে একটু বাজিরে দেখতে হবে।”

এই বলে নিতাই হঠাতে বিকট একটা হাঁক মারল, “ঠাকুরমশাই আছেন নাকি? ঠাকুরমশাই!”

ভেতরে শুরুগঞ্জীর গলাটা হঠাতে থেমে গেল। একটু বাদে নে লোকটা মন্দির থেকে পেরিয়ে এল তাকে দেখে ফটিকের মৃদু যাওয়ার জোগাড়। যাড়ে গর্বনৈ বিশাল চেহারা, পরনে উচ্চতাকে লাল রক্তস্বর, গগায় কুস্তাকের মালা, কপালে তেল সিদ্ধুনের বিশুল আঁকা, চোখ দুখানা ভাটার মতো ছাইছে।

বজ্রগঞ্জীর ঘরে লোকটা জিজ্ঞেস করল, “তোমরা কারা? কী চাও?”

নিতাই শেখ গলা তুলে বলে উঠল, “পেমাম হই ঠাকুরমশাই! তা অনেকদূর থেকে আসচি। পেমাম এই অষ্টভূজার মন্দিরে নিয়মিত নরবলি হয়। সেই শুনছি আসা।”

লোকটা বলল, “আত চঁচামেচি করার দরকার নেই। ওতে মারেন বিশ্বাসের বাধায় হয়।”

২৮

নিতাই গলা একটুও না নামিয়ে দের চেঁচিয়ে বলল, “বড় আশা করে এসেছি যে ঠাকুরমশাই। এসেই শুনতে পেলু আপনি আজ রাতেই মারে সামনে নরবলি দেবেন। আমাদের ভাগ্যটা ভালটি, কী বলেন!”

লোকটা অশ্বত্তি বোধ করে চারদিকে ঢেয়ে নিয়ে চাপা গলায় বলল, “তোমরা ভুল শুনেছ!”

নিতাই দুর্খের গলায় বলল, “এইহে, এতবড় একটা ভুল খবর পেয়ে এতদূর এসে আসে নরবলি! দেখার যে খুব সাধ ছিল মশাই!”

লোকটা চোখ হঠাতে বিলিক দিয়ে উঠল, বজ্রনির্দোষে বলে উঠল, “মেখাত চাও?”

নিতাই কিছু বুবে ওঠার আগেই হঠাতে কোথা থেকে দুটো মুশকো লোক এসে দুলিক থেকে ধরে তাকে পেড়ে ফেলল। তারপর চোখের পলকে হাত দুটো পিঞ্জিৰোড়া করে আর পা দুটোও দেবে তাকে হাড়িকাঠে উপুড় করে ফেলে গলার কাছে বিলটা আটকে দিল।

অবরুদ্ধ লোকটা চেঁচাচ্ছিল, “ওরে তাড়াতাড়ি কর! তাড়াতাড়ি কর! সতীশ দারোগা এসে পড়াবে।”

দুটো মুশকো লোক, একজন সৌড়ে গিয়ে একটা ঢাক নিয়ে এসে ট্যাঁ ট্যাঁ করে বাজাতে লাগল, অন্যজন একখানা চকচকে খাঁড়া এনে বনবন করে ঘোরাতে ঘোরাতে “জয় মা, জয় মা অষ্টভূজা! জয় মা নৃমণ্ড-মাসিনী” বলে নিতাইয়ের চারদিকে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘূরতে লাগল।

ঠাকুরমশাই উচ্চস্বরে বলিল মন্ত্র পড়ছেন আর মাঝে-মাঝে বলে উঠছেন, “নররক্ত চাই মা? নরবলি চাই মা? তোর ইচ্ছেই পূর্ণ হোক।”

মন্ত্র পড়া শেষ করে ঠাকুরমশাই বলে উঠলেন, “তাড়াতাড়ি কেটে

২৯

ফেল বাবা, সতীশ দারোগা কখন হানা দেয় তার ঠিক নেই।”

যে ঢাক বাজাইছিল সে দোড়ে গিয়ে একটা মাটির সরা এনে নিতাইয়ের শুধুর নীচে পেতে দিল, বেধ হয় এতে করেই কাটা মুক্তি নিয়ে গিয়ে অট্টভূজাকে ভোগ দেবে।

দ্বিমি দ্বিমি করে ঢাক বাজাতে লাগল। নিতাইয়ের মনে পড়ল, বলিয়ে সময়ে এরকম বাজনাই বাজে বটে। ভয়ে সে চোখ বুজে ফেলল। নাঃ, অট্টভূজার মন্দিরের কাপালিকে চাটনোটা বড় আহাম্মাকিই হয়ে গেছে।

ঠাকুরমশাই জলদস্তীর গলায় বলে উঠলেন, “জয় মা! এবার ঘাচাং করে দাও হে গদাইচাদ।”

“আজ্জে বাবা!” বলেই খাড়াটা ওপরে তুলল বলাই।

খাড়াটা নেমেও এল বটে, তবে মেশ আস্তে। নিতাই ঘাড়ে একটু চিনিনে বাধা টের পেল। তার গলা বেয়ে দু'ফোটা রক্তও পড়ল সরায়।

লোকটা খাড়াটা ফেলে হাড়িকাঠের খিল খুলে দিয়ে হাত পারের বাখন আলগা করে নিতাইকে দীড় করিয়ে একগাল হেসে বলল, “তোর বড় ভাগ্য, মায়ের কাছে বলি হলি, তোর চৌক পুরুষ উন্নতির পেয়ে গেল।”

ঠাকুরমশাই সরাটা তুলে নিয়ে ভক্ষিণীগণ গলায় “জয় মা, এই যে নররক্ত এনেছি মা, নে মা নে মা” বলতে কাতে মন্দিরে ঢুকে গেল।

নিতাই ঘাড়ে হাত বুলিয়ে বলল, “বাল হয়ে গেলুম নাকি? কিন্তু ঘাড়া তো আস্তই আছে।”

বলাই একটু হেনে বলল, “এর বেশি বলি দেওয়ার কি উপায় আছে রে? সতীশ দারোগা নিয়ে গিয়ে ফটিকে পুরবে যে। তারপর ফাসিতে বেগালে। আসলে বলি হত ঠাকুরমশাইয়ের পিতামহেরে

আমলে। এখন যা হয় তাকে কী একটা বলে যেন, পতিক না পরীক কী ফেল।”

“পতিক নয় তো।”

“হাঁ হাঁ, ওইটোই। বলিও হল, ঘাড়ও আস্ত রহল, মাও নররক্ত পেয়ে খুশি হয়ে গেলেন।”

চাকি লোকটা একটু তলোয় করে আয়োডিল এনে তার ঘাড়ের কাটা জায়গাটায় লাগিয়ে বলল, “এবার কেটে পড়ো তো বাপু, সতীশ দারোগা এনে পড়াল বিস্তু সবাইকে থানায় নিয়ে যাবে।”

হতবন্দি নিতাই আভাস তাড়ি রওনা হল। বাঁশবনের মধ্যে ফটিকের সঙ্গে দেখা। ভয়ে কাপাছে।

“তুই যে বলি হলি? ভূত নোস তো।”

“ভাতও বলতে পারিস।”

“ওরে বাবা—”

ঠাঁঠ একটা বাঁশের ডগা মাটমট করে দুলে উঠল, ওপর থেকে কে একজন হেঁড়ে গলায় বলে উঠল, “কে রে, কোন ভূত চুকেছিস আমাদের বাঁশবনে?”

দু'জনেই ভয়ে হিম হয়ে গেল। নিতাই কাঁপা গলায় কোনও রকমে বলল, “আমারা ভূত্যুক্ত নই, নিতাইকি মনিয়ি।”

বাঁশের ডগাটা আবার নড়ল। হেঁড়েগলা বলল, “আ, তুই তো একটু আগে অট্টভূজার মন্দিরে বলি হলি।”

“যে আজ্জে।”

“তা তোর কপালটা ভাল, আমাদের কপাল তত ভাল ছিল না। ওই হর ঠাকুরের ঠাকুর্দা বীর কাপালিকের হাতে আমরা সতীই বলি হয়েছিলাম। সেই থেকে কবন্ধ হয়ে এই বাঁশবনে থানা গেড়েছি।”

নিতাই সভায় জিজেস করল, “হা-ডু-ডু খেলতে হবে নাকি? শুনেছি, আপনারা মানুষ পেলে হা-ডু-ডু খেলেন।”



“সে খেলতুম রে। মনসাপোতার জয়নাথ পশ্চিত আমাদের একটা দাবা আর ঘূঁটি কিনে দিয়েছে। খেলাটাও শিখে নিয়েছি। আহা, দাবার মতো খেলা নেই। হা-হৃ-হৃ আবার একটা খেলা ? যা, তোরা, আমার মন্ত্রী এখন ঘোড়ার মুখে পড়েছে।”

দু'জনে হড়মুড় করে বাঁশবন্টা পেরিয়ে করালেখরীর খালের ধারে এসে পড়ল। কিন্তু কোথায় বাবা ? ওকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে আছে। খালের ভেতর দিয়ে পাইচলার রাস্তা। ফটিক হাঁফ ছেড়ে বলল, “যাক বাবা, দাঁড়িতে ঝুলে পেরোতে তো হবে না।”

সক্ষে হয়ে আসছে। ওপারেই দোমেছে।



খাল্টা যখন প্রায় পেরিয়ে এসেছে তখন দেখা গেল একটা লোক উন্মুক্ত হয়ে বসে আছে। তার পায়ের কাছে অনেক গোদা গোদা টিকটিকি, লোকটা একটা খালুই থেকে চূনোমাছ বের করে টিকটিকিদের খাওয়াচ্ছে। আর তারাও মহানদে লাফিয়ে লাফিয়ে থাচ্ছে।

দৃশ্যটা দেখে দাঢ়িয়ে গেল দু'জন।

ফটিক বলল, “লোকটার বজ্জত দয়ার শরীর, টিকটিকিদের মাছ খাওয়াচ্ছে দ্যাখ!”

লোকটা মুখ তুলে বলল, “টিকটিকি নয় গো, টিকটিকি নয়।”

“তবে?”

“এরা সব হল করালেশ্বরীর বিখ্যাত কুমির। একসময়ে দশ বিশ হাত লব্ধি ছিল। আন্ত আন্ত গোরু মৌষ ছাগল কপাত কপাত করে গিলে ফেলত। তা করালেশ্বরীর খাল হেজেমাজে গেল, আর কুমিরগুলোও না থেকে পেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে সব একটুখানি হয়ে গেল। তাদের বাচাণগুলোও ছেট ছেট হতে লাগল। তস্য বাচাণগুলো আরও ছেট হতে লাগল। হতে হতে এই দশা।

“কুমির?” বলে ফটিক এক লাফে উচু ডাঙায় উঠে গেল।

লোকটা বলল, “ভয় নেই গো, ওদের কি আর সেই দিন আছে? এখন চূনোমাছের চেয়ে বড় কিছু খেতেই পারে না। আর তা-ই বা ওদের দেয় কে বলো! এই আমারই একটু মাঝা হব বলে বিকেলের দিকে এসে থাইয়ে যাই।”

নিতাই কোমরে হাত দিয়ে দাঢ়িয়ে দৃশ্যটা দেখে বলল, “মনে হচ্ছে এ হল কুমিরের বনসপ্তি।”

সঙ্গে হয়ে আসেছে বলে দু'জনে আর দাঢ়াল না। করালেশ্বরীর মরা খাত পেরিয়ে দেগোছের মাটিতে পা দিয়েই তারা বুবাল, এ এক বর্ধিষ্ঠ প্রায়। অনেক পাকা বাঢ়ি, বাঁধানো রাস্তা আর দোকানপাট দেখা যাচ্ছে।



কয়েক পা এগোতেই একজন বেশ আঞ্চনি চেহারায় লোকের সঙ্গে তাদের মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। ধূতি পাঞ্জাবি পরা, গোলগাল চেহার আৰ হাসি-হাসি মুখের লোকটা তাদের দেখেই বলে উঠল, “এই যে, তা কোথা থেকে আসা হচ্ছে?”

ফটিক বলল, “আজে, অনেক দূর থেকে।”

“বাঁ বাঁ বেশ। তা নটবর রায়ের বাড়ি যাবে নাকি?”

ফটিক অবাক হয়ে বলল, “কী করে বুবালেন?”

“সে আর শক্ত কী? তা তোমাদের মধ্যে কোনজন ফটিক ঘোষ বলো তো! না কি দু'জনেই ফটিক ঘোষ?”

ফটিক হাঁ। এ যে তার নামও জানে!

নিতাই তাড়াতাড়ি বলল, “এই হল ফটিক ঘোষ। আর আমি নিতাই।”

লোকটা আঞ্চনি গলায় বলল, “পায়রাডাঙ্গার হরিহর ঘোষের ছেলে তো তুমি, তাই না?”

ফটিকের প্রথমটায় বাক্য সরল না, এত অবাক হয়েছে সে। তারপর বলল, “কী করে জানলেন?”

“আমি অন্তর্যামী যে। তা নটবর রায়ের বাড়ির পথ খুব সোজা। এই রাস্তা ধরে নাক বরাবর চলে যাও। চৌপথির পরেই দেখবে ডানধারে মস্ত দেউড়ি, বিরাট বাগান, আর খুব বড় দালানকোঠাগুলা বাড়ি। ফটকে ভোজপুরি দরোয়ান আছে। ও বাড়ি ভুল হওয়ার জো নেই।”

“লোকটা হাসি-হাসি মুখ করে ভানধারের রাস্তা দিয়ে চলে যাওয়ার পর ফটিক নিতাইয়ের দিকে চেয়ে বলল, “কিছু বুবাতে পারিল নিতাই?”

“কী বুবুব ?”

লোকটা আমাকে চিল কী করে ! আমার বাবার নাম, গাঁয়ের নাম অবধি জেনে বলে আছে !”

নিতাই বলল, “তুই যে আসবি সেটা বোধ হয় নটবর রায় সবাইকে বলে রেখেছে। তবে লোকটার একটা কথা একটু গণ্ডগোলেনো !”

“কোন কথাটা বল তো !”

“ওই যে বলল না, তোমাদের মধ্যে কোনজন ফটিক ঘোষ বলে তো ! না কি দুজনেই ফটিক ঘোষ। কথাটা হল, দুজন ফটিক ঘোষ হয় কী করে ?”

“হাঁ, সেটাও ভাববার কথা !”

“অত ভেবে লাভ নেই, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। আগে তোম পিসির কাছে চল তো !”

পাঁচ ছয় মিনিট পর চৌপথি পেরিয়ে যে বড়টির মেডিউন সামনে তারা দাঁড়াল তাকে বাড়ি না বলে প্রাসাদও বলা যাব। বিশাল দেউড়ি, ভেতরে মস্ত বাগান, বাগান পেরিবে কিন্তু বড় সোতলা বাড়ি। বাড়ি দেখে দুজনেই হৈ।

নিতাই বলল, “তোর পিসেছানাই যে এত বড়লোক তা আগে বলবি তো !”

ফটিক বলল, “দুঃ। পিসে বা পিসির কোনও খবরই তো আমরা জানতাম না। যাগাখেগাই ছিল না। শুধু জানতাম আমার এক পিসি আছে, কিনেক দূরে থাকে।”

দুজনে একটু ভয়ে ভয়ে ফটকের দিকে এগিয়ে যেতেই বিশাল

চেহারার ভোজপুরি দরোয়ানটাকে দেখতে পেল। মিলিটারির মতো পোশাক, বিশাল পাকানো শৌক, বড় জুলপি, মাঝে আবার পাগড়িও আছে।

তাদের দেখেই দরোয়ান উঠে দাঢ়িয়ে বলল, “আম রাম বাবুজি। ফটিক ঘোষ আছেন নাকি আপনারা ?”

ফটিক বলল, “আমি ফটিক ঘোষ, আর এ হল আমার বক্র নিতাই।”

“পায়রাজাঙ্গার হুবিহু ঘোষের ছেলিয়া তো !”

“হ্যাঁ। কিন্তু আপনি আমাকে চিললেন কী করে ?”

“জান পছান তো কুকু নাহি। লেবিন আপনাকে দেখে মনে হল কি আপ ফটিক ঘোষ ভি হোতে পারেন। তো সিধা চলিয়ে যান, এই বক্র কাছার ঘরে বড়বাবু ফটিক ঘোষের জন্য বসিয়ে আছেন।”

ফটিক আর নিতাই পরম্পরের দিকে তাকাতাকি করে নিল। তারপর একটু ভ্যাবাচাক মুখে গুঠিগুঠি ফটিক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল। অনেকটা হৈটে গিয়ে তবে কাছারিধর।

অনেক সিডি ভেতে মস্ত মস্ত থামওলা বারান্দা পেরিয়ে তবে কাছারিধর। তা ঘরখানাও হলখারের মতো। বাড়লঞ্চ আর দেওয়ালগিরির আলোয়া ঝলকল করছে। নিউ মস্ত এক তক্ষপোশে সাদা ধপধপে বিছানায় যিনি বসে আছেন তাঁর চেহারাটা দেখবার মতো। যেমন লঙ্ঘাওড়া তেমনই টকটকে ফরসা বং, গায়ে ফিলফিনে আদিদির পাঞ্জাবি আর তেমনই ফিলফিনে শৌখিন ধূতি। চেহারাটা এত শক্তপোক্ত যে, বয়স বোা যায় না। আর চোখ দুটো এত তীক্ষ্ণ যে, তাকালে ভয়-ভয় করে। মুখখানা খুবই গঞ্জার। ফটিক আর নিতাই পটাপট প্রগাম সেরে নিল।

তিনি তাদের দিকে গাঞ্জির মুখে চেয়ে বললেন, “কে তোমার ?”

ফটিক আমতা আমতা করে বলল, “আপনাই কি নটবর রায়—

মানে পিসেমশাই?"

"আমিই নটবর রায়, তবে পিসেমশাই কিনা তা জানি না। তোমরা কোথা থেকে আসছ?"

ফটিক জড়োসড়ো হয়ে বলল, "পায়রাডাঙ্গ থেকে। আমি হরিহর ঘোষের ছেলে ফটিক।"

একথায় নটবর রায় বিশেষ খুশি হলেন বলে মনে হল না। জু কুঁচকে বললেন, "সবাই তাই বলছে বটে। দেখি, চিঠিখানা দেখি।"

ফটিক তাড়াতাড়ি তার টিলের বাজ্জা খুলে একখানা চিঠি দের করে নটবর রায়ের হাতে দিয়ে বলল, "এই যে চিঠি, আমার বাবা পিসিকে দিয়েছেন।"

নটবর রায় চিঠিখানা সরিয়ে রেখে বললেন, "এ-চিঠির কথা বলিনি। তোমার বাবার হাতের দেখা আমরা চিনি না, কাণ্ড তাঁর সঙ্গে আমাদের দীর্ঘকাল যোগাযোগ নেই। কাজেই এই চিঠি থেকে প্রমাণ হয় না যে তিনিই আসল হরিহর ঘোষ বা তুমিই তাঁর ছেলে ফটিক।"

"তা হলে কোন চিঠি?"

"তোমার পিসি তোমার বাবাকে যে পোস্টকার্ডখানা পাইয়েছিলো সেখান কোথায়? সেই চিঠির নীচে পুনশ্চ দিয়ে দেখা ছিল, ফটিক যেন চিঠিটা সঙ্গে নিয়ে আসে।"

ফটিক খুব কাঁচমাচ হয়ে বলল, "আজে, সেই সঙ্গে করেই আনছিলাম, তবে পথে খোয়া গেছে। একজন লোক চিঠিটা যাচাই করতে নিয়ে গেছে, আর ফেরত দেয়নি।"

নটবর রায় গভীর থেকে গভীরভর হয়ে বললেন, "বাঃ, দেশ বেশ। চমৎকার। তা শোনো হে ছেকরা, গত চারদিনে তোমাকে নিয়ে অস্তত যোলোজন ফটিক ঘোষ এসে হাজির হয়েছে। তারা সবাই বলেছে প্রত্যোকেই নাকি পায়রাডাঙ্গ হরিহর ঘোষের ছেলে

ফটিক ঘোষ। কেউই অবশ্য পোস্টকার্ডখানা দেখাতে পারেনি। আমার যত্নের জানা আছে, আমার সবকিং হরিহর ঘোষের একটাই ছেলে, তার নাম ফটিক। কিন্তু যদি হরিহর ঘোষের যোলোজন ছেলেও হয়ে থাকে তা হলে সকলেরই নাম ফটিক হয় কী করে বলতে পারো?"

বিশ্বায়ে ফটিকের মূর্ছা যাওয়ার জেগাড়। সে বিড়বিড় করে শুধু বলল, "যোলোজন ফটিক ঘোষ?"

নটবর রায় বললেন, "হ্যাঁ পাকা যোলোজন। কে আসল কে নকল তার বিচার করার মতো সময় আমার নেই। যদি পোস্টকার্ড দেখাতে পারো তবেই বুবাৰ আসল লোকটা কে। তা হলে এবার তোমরা এসো গিয়ে। আমার জরুরি কাজ আছে।"

নিতাই এবার একটু সাহস করে বলল, "আচ্ছা, সবাই ফটিক ঘোষ হতে চাইছে কেন জানেন?"

নটবর রায় মাথা নেড়ে বললেন, "না হে বাপ, আমি জানি না।" ফটিক করণ মুখ করে বলল, "পিসির সঙ্গে একটু দেখা—"

"না হে বাপ, দেখা হওয়া সম্ভব নয়। কে কার পিসি তারই টিক নেই। তোমরা এবার এসো।"

দু'জনে গুটি গুটি বেরিয়ে এল। দু'দিন ধরে খানিক টেল, খানিক বাস, তাৰপৰ মাইলের পর মাইল হেঁটে লেজেজান হয়ে এত দূর আসার যে কোনও মানেই হল না, সেটা বুকতে পেরে ফটিকের পা চলছিল না। সে অসহায় গলায় বলল, "নিতাই, কিন্তু বুৱাতে পাৰলি?"

"না। তবে একটা যত্ন আছে বলে মনে হচ্ছে।"

"কীসের যত্ন?"

"সেটাই ভাৰছি। যত্ন না থাকলে মহাদেব দাস তোৱ কাছ থেকে চিঠিটা চালাকি করে হাতিয়ে নিত না।"

“সেটা আমারও মনে হচ্ছে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না। পিসির বাড়িতে ভাইপো আসবে, তার মধ্যে এত ভেজাল কীসের মেঝে বাবা! আগে জানলে কখনও এত কষ্ট করে আসতাম না।”

ফটকের কাছে ভোজপুরি দরোয়ানটার সঙ্গে দেখা। খুব আল্লাদের গলার বলল, “কী খোকবাবু, জান পহচান হোলো?”

ফটিক মাথা নেড়ে বলল, “না দরোয়ানজি, উনি আমাদের পাণ্ডি দিলেন না। কী ব্যাপার বলতে পারেন?”

“সো হামি কুছু জানি না। লেবিন রোজ দু-চারটো করে ফটিক ঘোষ আসছে বাবুজি। ইন্তা ফটিক ঘোষ কভি নেই দেখা। নাটা ফটিক ঘোষ, লদ্বা ফটিক ঘোষ, মোটা ফটিক ঘোষ, রোগা ফটিক ঘোষ, কালা ফটিক ঘোষ, কর্মা ফটিক ঘোষ। রোজ আসছে। উসি লিয়ে বড়বাবু কুছু পারসান মালুম হোতা।”

ফটিক পেরিয়ে দুঁজন ফের রাস্তায় পড়ল।

ফটিক বলল, “এখন কী করা যায় বল তো! সঙ্গে হয়ে গেছে, এখন তো আর ফিরে যাওয়া যায় না। রাতটা এখানেই কটিতে হবে যে।”

নিতাই বলল, “ভাবিস না। একটা রাত ঠিক কাটিয়ে দেওয়া যাবে। এখন চল, জায়গাটা একটু ঘুরিফিরে দেখি।”

ফটিক দাঁত কড়মড় করে বলল, “মহাদেব দাসকে এখন পেলে তার মৃণুটা ছিড়ে ফেলতাম। ওই লোকটার জন্মতো এত হেনহা হতে হল।”

নিতাই বলল, “মাথা গরম করে রাত আছে কিছু? দোষ তো তোরই। তুই চিটিটা ফস করে দিয়ে ফেললি।”

“তখন কি জানি চিটিটা নিয়ে এলে পিসির বাড়িতে ঢুকতে দেবে না। তা ছাড়া আমরা তো ফিরেই যাচ্ছিলাম।”

“যাক গে, যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন চোখকান খোলা রেখে

চল তো, আমি একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।”

ক্লান্ত শরীরে তারা বেশি ঘূরতে পারল না। তবে দেগোছে যে বেশি ভাল জায়গা, সেটা বোধ নেল।

নিতাই বলল, “গনা ভাইনির ফলার হজম হয়ে আমার এখন বেশ হিন্দে পাচ্ছে।”

ফটিক বলল, “আমারও। চল, ওখানে একটা বেশ কক্ষাকে মিট্টির দোকান দেখা যায়ে।”

মিট্টির দোকানটায় বেশ ভিত্তি। সামনে পাতা বেকে কয়েকজন লোক বসে শান্তভাবে বরছে। তারা দুজন দোকানের কাছেকাছি আগামতো দেখানের এক ছেকেরা কর্মচারী বলে উঠল, “ওই যে, ফটিকবাৰ এসে গেছেন।”

নিতাই ফটিককে একটা ঢেলা দিয়ে বলল, “তুই এখন বিখ্যাত লোক।”

ফটিক গাঁউরি হয়ে বলল, “তাই দেখছি।”

কর্মচারীটা হাসিমখে বলে উঠল, “ফটিকবাৰ তো? পায়রাডাঙার হরিহর ঘোষের ছেলে ফটিক ঘোষ?”

যারা বেকে বসে ছিল তারা তাদের দিকে খুব তাকাতে লাগল। একজন বলে উঠল, “ওঁ, এই কয়েকদিনে যা ফটিক ঘোষ দেখলুম এমনটা আর জাহোও দেখব না। দেখে কত ফটিক ঘোষ আছে রে বাবা!”

একজন বুড়োমানুষ বলল, “কেন হে, এই আমাদের দোগোছেতো তো চারজন সুধীর রায় আছে। তারপর ধোৱা দৈরাগী মণ্ডল আছে তিনজন, পাশের গাঁ ময়নপুরে নৱহারি দাস আছে পাঁচজন।”

একজন বলল, “আহা, তা বলে তো পনেরো-বিশজন করে নথ। আর সবারই বাপের নামও এক নয়।”

উত্তেজিত আলোচনা করে তর্কে দাঁড়িয়ে গেল। কেউ আর তাদের খেয়াল করল না। দু'জনে ভরপেট মিষ্টি খেয়ে নিল। নিতাই কর্মচারীটাকে জিজেস করল, “ভাই, এখানে কোথাও রাতে থাকার একটু জায়গা হবে?”

কর্মচারীটা বলল, “এখানে তো হোটেল টোটেল নেই। তবে সামনে এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকের পথ ধরলে চতুর্মণ্ডপ দেখতে পাবে, সেখানে থাকা যাবে।”

দু'জনে উঠে পড়ল। চতুর্মণ্ডপটা খুঁজে পেতেও বেশি ঘোরাঘুরি করতে হল না। বেশ বড় আঠচালা, চারপিক খোলা, তবে মেরোটা বীধানো, সারাদিনের ক্লাস্টির পর দু'জনে দু'খানা চাদর পেতে শুরে পড়ল। এত ক্লাস্টি যে, কথাবার্তাও আসছিল না তাদের। শোয়ামাত্র ঘূর্মিয়ে পড়ল।



মাঝরাতে পায়ে সুত্সুড়ি লাগায় ধড়মড় করে উঠে বসল ফটিক, ঘুমচোখে দেখল, পায়ের কাছে একটা লোক বসে আছে। সে তাড়াতাড়ি টিনের তোরঙ্গটা আকড়ে ধরে টেটিয়ে উঠল, “চোর! চোর!”

সেই চিক্কারে নিতাইও ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসল, “কোথায় চোর? কে চোর?”

“ওই যে চোর, দেখছিস না!”

লোকটা ভাসী বিস্তির গলায় বলল, “ওঃ, কী চিল-চেঁচানিটাই ঢেঁচে দ্যাখ, যেন ডাকাত পড়েছে! তা চোর বলে কি পচে গেছি

নাকি?”

লোকটার সাহস দেখে ফটিক হাঁ। তারপর একটু সামলে নিয়ে বলল, “চোরের চেয়ে ডাকাত অনেক ভাল। তারা প্রাচিপে টিপে আসে না, উকিলুকি মারে না, পায়ে সঙ্গুভূত দেয় না। চোরের হাবভাব অনেকটা ভূতের মতো। আর ডাকাতৰা অনেক বীর, তারা বুক ফুলিয়ে আসে।”

লোকটা তেতো গলায়, “ওঃ ভাকাতের প্রশংসায় যে একেবারে নাল বরাছে দেখছি, ছাঁট ছাঁট। ভাকাতি একটা ভদ্রলোকের মতো কাজ নাকি? কেনেও আট আছে ভাকাতির মধ্যে? রে-রে করে এল, গান্দাম গান্দাম করে দুরজা-কপটি ভাঙল, লাঠিসোটা বন্দুক তরোয়াল দিয়ে বক্সারক্ষি কাষ করল, তারপর লুটপাট করে চলে গোল! না আঠ বুদ্ধির খেলা, না ফেনও হাতের সূক্ষ্ম কারিকুরি, না দূরবৃষ্টি, না রসবোধ। ভাকাতের প্রতিভাব দরকার হয় না, বুকলে? ও হচ্ছে মোটা দাসের কাজ। কিন্তু চোর হতে গেলে মগজ চাই। তেমন তেমন ভাল চোর একশো বছরে একটা জন্মায়।”

চোরের মুখে এসব শব্দে ফটিকের আর কথা সরল না।

নিতাই বলল, “আপনি খুব বড় চোর নাকি?”

লোকটা দুঃখের সঙ্গে একটা দীর্ঘশাস ফেলে বলল, “বড় হওয়া কি ঘুরের কথা রে। চুরি বিদোগ হল সমুদ্রের মতো। যতই শেখো, শেখার শেষ নেই। আমি আর কী শিখেছি বলো। সমুদ্রের ধারে নৃত্ব কুড়েছি মাত্র। নবা ওস্তাদের কাছে নাড়া বাঁধা ছিল। বছর পাঁচেক মাত্র শাগরেনি করেছি। এখনও কত কী শেখার বাকি।”

“তা আপনি এত বড় চোর হয়ে আমাদের মতো ছেট মানুষের কাছে কী আর চুরি করবেন!”

লোকটা খিচিয়ে উঠে বলল, “এই না হলে বুদ্ধি। তোমাদের আছেটা কী বলো তো! ওই তো দুটো পলকা টিনের তোরঙ্গ আর

পেটিলা। ওসব তো ছিটকে ঢোরেও ছোবে না। ছুরি করতে এলে কি
পায়ে সুড়সুড়ি দিতুম?"

ফটিক বজ্জল, “তা হলে?”

“বাঃ, গৌরী নতুন কেউ এলো একটু বাজিয়ে দেবতে হবে না? কেৱল অতলবে আসা, কেৱল চৰুৱে ঘোয়াফেৰা, কাদেৱ সঙ্গে মাথামাথি—এসব গুৰুতৰ কথা না জানলে কি চলে?”

ফটিক বলল, “তা অবশ্য ঠিক। তবে আমাদের মতলব কিছু খারাপ ছিল না। কিংব দোষেছেতে এসে খুব শিক্ষা হল মশাই। আপনাদের গাঁয়ে আর নয়। কাল সকা঳েই মানে মানে দিবে যাচ্ছি।”

ଲୋକଟା ଥିବ କରେ ଏକଟା ଶବ୍ଦ କରିଲା। ସେଠା ହାମିଓ ହତେ ପାରେ, କଶିଓ ହତେ ପାରେ । ତାରପର ବଳଳ, “ଦୋଗେଛେ ଯେ ଭାଲ ଜୀବନ୍ଗୀ ନାୟକ ଆମିଓ ମାନଛି । ତବେ କିନ୍ତୁ ଦୋଗେଛେର ଢେରେ ବିଷ୍ଟର ଖାରାପ ହେବାଣାମ ଆମିକୁ ।”

“কান্তি লাকি ১”

ଲୋକଟା ଭାଲମାନୁଷେର ଗଲାଯ ବଲଲା, “ତା ନୟ? ଏହି ସେ ତୁମି
ଯୋଲୋ ନସର ଫଟିକ ଘୋଷ ଏସେ ଉଦୟ ହଲେ ତାର ଜନ୍ୟ ଦେଖେଛେ
ଲୋକ ତୋମାର ପେଛନେ ଲୋଗେଛେ କି? କେଉ ତୋମାର ମାଥା^{ଚାଟିବି}
ମାରନେ, ସକଳ ଦେଖାଥିଲି, ଦୁଯୋଗ ଦେଯାନି। ଦିଯରେଛେ ବଲୋ? ତା ହାଲେ
ଦେଖେଗେ କାବାଗତ ତଳ କୀସେ?”

“ଆମি ମୋଟେଇ ସୋଲେ ନନ୍ଦର ଫଟିକ ଘୋଷ ନାହିଁ । ଆମିଇ ଆସିଲ
କଥିକି ଦୋଷ ।”

“କୋଣ ଆସିଲ କାହିଁ ଶିଖ ?”

“প্রমাণ করার দরকার নেই। শাহীন পিসি আসতে লিখেছিল বলে
কামা। এক ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে এবং ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে”

লোকটা বললে, পিসি আসতে লিখেছিল বললে, তা সে চিঠিখানা করে।

“চিঠিখনা খোয়া গেছে। রাসপুরের খালের ধারে মহাদেব দাস
সেখনা হাতিয়ে নিয়েছে।”

“চিঠিখনার কত সাম ভালো?

“না। চিত্রি আবাবু দাম কীসের

“সে আছে। যাকনো, হারিমেই বখন ফেলেছ তখন আর কথা কী? তা এই মহাদেব দাস লোকটি কে বলো তো! কেমন চেহারা?”

“কেমন আৰ চেহাৰা, বেটিখাটো, কালোমত্তো, আমাদেৱ ঠকিয়ে
থেৱা পাৰ কৰে পৰ্যট টাকা অৱ কথাবাৰ দাম হিসেবে আৱও দু' টাকা
নিয়েছিল।”

ଲେଖନୀ ଥିଲା କରେ ଫେରି ଏକଟା ଶବ୍ଦ କରିଲା । ହାସି ବା କାଣି ଯା
ହେବି ଏକଟା ହେବେ । ତାରପର ବଲଙ୍ଗ, “ତୋମାଦେର ମନ୍ତ୍ରୋ ମୁରଗି ପେଲେ
କେବଳ ଜାଇଁ କରିବେ ବଲୋ । ଆମାରାଇ ଇଚ୍ଛେ କରାରେ । ତାବେ ବିଲା ଆମି
କିମ୍ବା ଘେରେ କାହାର ପାଇଁ କରିବା ?”

ମିଶନ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପଦକୁ ଲିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

‘**मैं तो यह देखा नहीं।**’ लोकानन्द अभिनव विजय की बात

ମାନୁଷ ତାଙ୍କ ଆଜେ;

“କେବେ କେବେ କେବେ କେବେ”

নিতাই গলাটা নামিয়ে বলল, “চিঠির দামের কথা কী যেন
বলছিলেন?”

"বালেছি নাকি? ও হল বয়সের দোষ। মুখ ফসকে কী বলতে কী
বেরিবে যাব?"

“বুঝিছি, আপনি আর ভেঙে বলবেন না। আজ্ঞা, এই দোগেছে গীরে এত ফটক যোথ কেন আসছে তা কি বলতে পারেন? আমরা যে মাল্লো কিটো স্বাক্ষর পেতে চাই-”

“ও বাপু, আমি জানি না। রাম-শ্যাম-যদু-মধু কতই তো আসে।
কে কেবল কাল সকালেই এক করে মিহির যাবে?”

ফটিক বলল, “আজ্জে হ্যাঁ। পিসির বাড়ির যত্নআন্তি তো খুব পেলুম। ভরপেট খাওয়া ঝুটল না, চট্টীমগুপে শুরে রাত কাটাতে হচ্ছে।”

“তা কষ্ট না করলে কি কেষ্ট পাওয়া যায় হে!”

ফটিক গরম হয়ে বলল, “আহা, কী কেষ্টই পেলুম। আর কট্টেরও দরকার নেই, কেষ্টেরও দরকার নেই।”

নিতাই ফটিকের দিকে চেরে বলল, “আহা, অত মাথা গরম করিসনে তো! ইনি একটা কিছু বলতে চাইছেন, সেটা একটু বুৰাতে দে।”

লোকটা একটু উদাস গলায় বলল, “না না, আমি আর কী বলব? আসার পথও খোলা আছে, যাওয়ার পথও খোলা আছে। যেতে চাও তো যেতেই পারো, কেউ তো আটকাছে না। তবে কি না—”

নিতাই মুখটা বাড়িয়ে বলল, “তবে কী?”

“এই বলছিলুম আর কী, কয়েকটা দিন এখানে থাকলে রগড়টা দেখে যেতে পারতো।”

“কীসের রগড়?”

“তা কি আমিই জানি ছাই। মনে হচ্ছে একখানা রগড় বেশ পাকিয়ে উঠছে।”

নিতাই একটা দীর্ঘশাস ফেলে বলল, “কিন্তু ধূকার তপায় কী বলুন! এখানে থাকবই বা কোথায়, ধূয়েই বা কী? আমাদের পয়সাকড়িও শেব হয়ে আসছে।”

লোকটা একটু দোনোমুঠো করে বলল, “তা থাকতে চাইলে অবশ্য একটা কাজ করতে পারো।”

“কী বলুন তো!”

“দিনের আগো ঝুটলে এই রাস্তা ধারে যদি সোজা চলে যাও তো ডানহাতি প্রথম রাস্তায় মোড় ফিরে কিছুদূর হাঁটলেই গড়াই বুড়ির

বাড়িটা দেখতে পাবে। পাকা বাড়ি, তবে পুরানো, গড়াই বুড়ি এই গত মাঘ মাসে পটল তোলার পর থেকে বাড়িটা ফাঁক পড়ে আছে। বুড়ির তিন কুলে কেউ ছিল না বলে দখল হয়নি।”

ফটিক বলল, “ও বাবা, ও বাড়িতে নির্বিত সাপখোপ আছে।”

“গাঁয়ের ছেলে হয়ে সাপখোপ ভয় পেলে কি চলে? একটু সাবধানে থাকলে ভয়টা কীসের? চারটে দেওয়াল, মাথার ওপর ছাদ—আর চাই কী?”

নিতাই বলল, “থাকার যত্নহী না হয় হল, কিন্তু যাওয়া?”

“দোয়েছেকে যতটা ধারাগা বলে ভেবেছে, ততটা কিন্তু নয়। কুমোরপাড়ুর মোড়ে নুটুবাবুর লঙ্ঘরখানা দেখতে পাবে। দু’ বেলা গরম ভাত, ডাল, তরকারি।”

ফটিক নাক সিটকে বলল, “লঙ্ঘরখানা! সেখানে তো ভিখিরিবা থাই।”

লোকটা নির্বিকারভাবে বলল, “তা থাই। ভিখিরিবা যাব বলে কি বাবুদের গালে উঠছে না নাকি? এং, যেন নবাবপুর এলেন। কালীমাতা মিষ্টান্ন ভাঙারে বসে গুচ্ছের চপ, শিঙাড়া, জিলিপি, অমৃতি গিলে পেট গরম করার চেয়ে নুটুবাবুর লঙ্ঘরখানার গরম গরম ভালভাত কি খারাপ হল?”

নিতাই বলল, “না না, নুটুবাবুর লঙ্ঘরখানাই ভাল কিন্তু আমরা যে কালীমাতা মিষ্টান্ন ভাঙারে বসে চপ, শিঙাড়া, জিলিপি আর অমৃতি খেয়েছি তা আপনি জানিলেন কী করে?”

লোকটা তেমনই নির্বিকার গলায় বলল, “চোখকান খোঙা রাখবেই জানা যায়। তোমাদের দোষ কি জানো? ভগবান দুটো চোখ দিয়েছেন, এক জোড়া কান দিয়েছেন, কিন্তু সেগুলো ঠিকমতো ব্যবহার করতেই শিখলে না। ছ্যাঃ ছ্যাঃ। যাকদে, তোর হয়ে আসছে। আমি চলি।”

নিতাই বলল, “আপনার নামটা তো জানা হল না!”

লোকটা মাথা চুলকে বলল, “মাম! এই তো মুশকিলে ফেললে, কেন নামটা বলি বলো তো।”

“বেটা খুশি।”

“তা হলে তোমরা আমাকে নদিয়াদা বলে ডাকতে পারো। তবে বেশি খৌজখবর করতে যেও না, তা হলে বিপাকে পড়বে। দরকারমতো আমি উদয় হব’খন।”

ফটিক হচ্ছাই বলল, “গড়াই বুড়ির বাড়িতে তালা দেওয়া থাকলে তুকব কী করে? লোকে যদি চোর বলে ধরে?”

“তালাটালা নেই, দড়ি দিয়ে কড়া দুটো বাঁধা আছে। আর যদি সোকে চোর বলে ধরে ঘা-কতক দেয়ই, তা হলে হাসিমুখে সেটা হজম করে নিও। হাটুরে কিল খেলে মানুষ পোক হয়। আর একটা কথা। পুর্ণিপূর্ণকে খুব ঈশিয়ার।”

এই বলে সোকটা উঠে অন্ধকারে ফুস করে মিলিয়ে গেল।

ফটিক বলল, “থ্রেত, এ লোকটা আমাদের ফাঁদে ফেলতে চাইছে।”

নিতাই মাথা নেড়ে বলল, “আমাদের ফাঁদে ফেলে কী ভাঙ্গ আমাদের আছেটা কী বল তো। কিন্তু পুর্ণিপূর্ণটা আমার কেন?”

“কে জানে! চোরছাঁচড়ের কথায় বিশ্বাস কর্যা ঠিক নয়। চল, আমরা ফিরেই যাই।”

“কিরে যাওয়া তো আছেই। কিন্তু বড়সোটা কী, কেন এত ফটিক যোষ এখানে আসছে সেটা তো আর জানা হবে না, লোকটা হচ্ছাই পুর্ণিপূর্ণের কথাই বা বলে গেল কেন? আমার মনে হচ্ছে, একটু কষ্ট করে দুটো-একটা দিন থেকে যাওয়াই ভাল।”

ফটিক একটু গাত্র খুই করে রাজি হল। বলল, “কিন্তু বিপদ আপন হলে কিন্তু ভাই দায়ী।”

“বিপদভাপদ তো কপালে আছেই মনে হচ্ছে। আর সেইজন্যাই আমার মনটা চনমন করছে। পায়রাডাঙ্গা ফিরে গিয়ে কেন লবড়ক্ষা হবে বল তো!”

ফটিক একটু ভেবে একটা শ্বাস ফেলে বলল, “তা ঠিক।”



সকালের আলো ফুটেই দু’জনে বেরিয়ে পড়ল, সোজা বেশ আনিকটা গিয়ে ডানধারে একটা কাঁচা রাস্তা। লোকবসতি বিশেষ সেই বড় বড় গাছের ছায়ায় রাস্তাটা অঙ্ককার হয়ে আছে। অথমদিনে দু’চারখানা কুঁড়ের দেখা যাচ্ছিল বটে, কিন্তু আরও এগোতেই লোকবসতি শেষ হয়ে আগাছার জঙ্গল শুরু হয়ে গেল। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর বাঁ ধারে ছাড়া-ছাড়া জঙ্গলের মধ্যে একখানা ছোট পাকা ঘর দেখতে পাওয়া গেল। দেওয়াল মোনা ধরেছে, দেওয়ালের ফাটলে অশুখ গাছ গজিয়েছে। দিনের বেলাতেও যিবি ভাকছে। ভারী থমথমে জাগুগ।

দু’জনে একটু থমকাল। এভাবে পরের বাড়িতে চোকার অভিজ্ঞতা তাদের নেই। ফটিক ভয়ে ভয়ে বলল, “চোকটা কি ঠিক হবে রে নিতাই? ভাল করে ভেবে দারা।”

নিতাই বলল, “আর উপায়ই বা কী বল। কপালে যা আছে হবে। আয় তো দেখি।”

ফটিক বলল, “জাগগাটার কেমন ভৃত-ভৃত চেহারা।”

বাধো-বাধো পায়ে দু’জনে হাঁত্বর চোরকাটার জঙ্গল পেরিয়ে গড়াইবুড়ির ঘরের দরজা খুলে চুক্তে যাবে এমন সময়ে পেছনে

হঠাতে কে যেন ফিচ করে একটু হাসল। দু'জনে পেছন ফিরে দেখল
একজন সুত্রে রোগা বুড়োমতো লোক কেৱলো মুখে খুব হাসছে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ঢোকে ঢোক পড়তেই বলে উঠল, “কী মতলব হে,
কী মতলব? দেবেখন গড়াইবুড়ি পিণ্ড চটকে। যদি গোবিন্দ
সাউন্দের মতো ডাকসাইটে লোকই আজ অবধি দখল নিতে পারল
না, আর তোমরা কোথাকার কে এসে চুকে পড়ছ যে বড়? এই আমি
চললুম গোবিন্দ সাউকে খবর দিতে।”

বলে লোকটা হলহল করে হেঁটে ডানধারে কোথায় চলে গেল।

ফ্যাকাসে মুখে ফটিক বলল, “এই রে! কাকে যেন খবর দিতে
গেল? এবাব কী হবে রে নিতাই?”

নিতাইও একটু ঘাবড়ে গেছে। তবু সাহস করে বলল, “কী আর
হবে! যদি বের করে দেয় তো দেবে। আমরা বলব নিরাশ্য হলে
চুকে পড়েছিলাম।”

“তোর বজ্জ সাহস।”

নিতাই দরজার দড়ি খুলে ভেতরে চুক্কা। পেছনে ফটিক।

ঘৰদোৱের অবস্থা যতটা খারাপ হবে বলে তারা ভেবেছিল, দেখা
গেল ততটা নয়। মেবোয় ধূলো জমে আছে ঠিকই, একটু খুলও
পড়েছে চারধারে, তবে বসনাসের অযোগ্য নয়। ঘরে দু’খনা খাটিয়া
আছে, গেৰস্বালিৰ জিনিসপত্রও কিছু পড়ে আছে। ভেতরদিকে
উঠোনে পাতকুয়া, দড়ি বালতি সবই পাওয়া গৈল।

ফটিক বারবার বলতে লাগল, কেজিটা ঠিক হচ্ছে না রে
নিতাই।”

নিতাই ঠাণ্ডা গলায় বলল, “তোর মতো কিন্তু আমার ভয় করছে
না। গণা ডাইনি যদি আমাকে ঘোড়া বালিয়ে ফেলত বা অষ্টভুজার
মদিনে যদি সতিত বাল হয়ে যেতু তার চেয়ে খারাপ আর কী হবে
বল। আর আগে চানটান করে একটু তাজা হই, তারপর যা হওয়ার
৫০

হবে।”

দু'জনে সবে মান সেৱে এসে জামাকাপড় পাৱেছে, এমন সময়
বাইরে একটা চেঁচামেচি শোনা গেল। দু'জনে কৰ্মসূত্র করে শুনল
কে যেন হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে বলছে, “কৰে, কাৰ এত সাহস যে,
এ-বাড়িতে বলা নেই, কওয়া নেই চুকে বসে আছে? কাৰ এত বুকেৰ
পটা? অঁা!”

দৱজায় দমাদম শব্দ শুনে ফটিক হেৱা ফ্যাকাসে হয়ে বলল, “ওই
যো! এসে গেছে!”

নিতাই যিনো দমাদম খিলাটা খুলে দেখল, কপালে চন্দনেৰ ফোটা
আৰ গামে নমানৰ জড়ানো একটা যশোমতো লোক দাঁড়িয়ে। তাৰ
দিকে রঞ্জতকৃতে তাকিয়ে বলল, “কে তুই? কাৰ হকুমে এ বাড়িতে
চুকেছিস? জানিস এ-বাড়ি এখন কাৰ দখলে?”

নিতাই বিগলিত একটু হেসে বলল, “এ-বাড়ি কি আপনার?”

“আমাৰ নয় তো কাৰ? গড়াইবুড়িকে কড়কড়ে পাঁচশো টাকা
দিয়ে এ-বাড়ি কৰে কিনেছি আমি। দলিল আমাৰ সিন্দুকে। তোৱা
কেৱল সাহসে এ-বাড়িতে চুকেছিস?”

বলে লোকটা লাক দিয়ে ঘৰে এসে চুকল, তাৰপৰ পিছু ফিরে
হাঁক মারল, “ওৱে ও বিশু, লাঠিটা নিয়ে আয় তো দেবি—”

বেঁটেখাটো চেহারার একটা লোক মস্ত একটা লাঠি বাগিয়ে
এগিয়ে এল।

ফটিক তাড়াতাড়ি বলল, “আহা, লাঠিসৌচার দৱকাৰ কী মশাই?
আমৰা না হয় এমনিতেই যাচ্ছি।”

গোবিন্দ সাউ মুখ ভেঙ্গিয়ে বলল, “এমনিতেই যাচ্ছি মানে?
যাবে তো বটেই, তোমাৰ ঘাড়ে যাবে। আগে বলো কাৰ হকুমে
চুকেছে? এত সাহস হয় কোথা থেকে? অঁা!”

এইসব চেঁচামেচিৰ মাঝামানে হঠাতে খাটিয়াৰ তলা থেকে একটা

পেটেলের ঘটি হঠাতে লাফ মেরে শুন্মে উঠল, তারপর উড়ে গিয়ে ঠঠাত করে গোবিন্দ সাউয়ের কপালে লাগল।

“বাপ রে!” বলে গোবিন্দ সাউ কপাল ঢেপে বসে পড়ল মেখেতো। তারপর চেঁচাতে লাগল, “মেরে ফেলেছে রে! খুন করে ফেললো রে!”

নিতাই আর ফটিক হতভাঙ্গ হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। তারা কেউ ঘটিটা ঝুঁড়ে মারেনি! তা হলে কাণ্ডা হল কী করে?

বাইরে থেকে বিশু বলল, “পালান বাবু, গড়াইযুড়ি তের পেছেছে!”

গোবিন্দ সাউ কোনওক্ষণে দরজার বাইরে গিয়ে ফের গলা সঞ্চয়ে ঢাঢ়িয়ে চেঁচাতে লাগল, “তোর এত সাহস গড়াইযুড়ি? মরেও তেজ যাবনি তোর?”

বিশু গোবিন্দের হাত ধরে টেনে বলল, “চলে আসুন বাবু, ভূতপ্রেতের সঙ্গে কি লড়াই করে পারবেন? বেথোবে প্রাণটা যাবে।”

গোবিন্দ খিচিয়ে উঠে বলল, “নিকুঁচি করেছে প্রাণের। প্রাণ যাব তো যাবক। এই শুনে রাখ গড়াইযুড়ি, তোকে এই ভিটে থেকে উঠলে যদি না করি তো আমার নাম গোবিন্দ সাউ নয়। আমি এবাড়িতে শাস্তি স্বত্যজন করাব, তারপর কীর্তনের দল এনে অষ্টপ্রহর এমন কীর্তন করাব যে, তুই পালানোর পথ পাবি না—”

কথার মাঝাখানেই হঠাতে উঠানের নারকেলে গাছ থেকে একটা ঝুন্মা নারকেলে বৌঁচা ছিপে সা করে ছুটে এসে গোবিন্দ সাউয়ের মাথায় পটাত করে লাগল। গোবিন্দ চিতপাত হয়ে পড়ে চেঁচাতে লাগল, “গেছি রে! ধরে, আমি যে চোখে অন্ধকার দেখছি—”

নারকেলে দেখে বিশু দুই লাফে রাস্তায় পড়ে ছুটে উধাও হয়ে গেল।

নিতাই আর ফটিক কিছুক্ষণ বিশ্রয়ে হী করে কাণ্ডা দেখল। তারপর ফটিক বলল, “এসব কী হচ্ছে রে নিতাই, ঝুঁড়ে কাণ্ড যে!”

নিতাই বলল, “তাই দেখছি।”

কিছুক্ষণ মূর্জার মতো পড়ে থেকে গোবিন্দ হঠাতে মাথা কাঁকিয়ে উঠে বসল। তারপর ফ্যালায়াল করে তাদের দিকে চেয়ে বলল, “তোমাদের কিছু করেনি গড়াইযুড়ি?”

নিতাই বলল, “না তো।”

বই হাতে কপাল আর ডান হাতে মাথা ঢেপে খৌড়াতে খৌড়াতে রাস্তার উত্তে গোবিন্দ তাদের দিকে চেয়ে বলল, “আর এক ঘন্টার মধ্যে যদি এ-বাড়ি ছেড়ে চলে না যাও তা হলে কিন্তু আমি থানা থেকে পেয়ানো আনিয়ে—”

কথাটা ভাল করে শেষ হয়লি, কোথা থেকে একটা ডাঁশা পেয়ারা ছুটে এসে গোবিন্দের ডান গালে থাচাত করে লাগল।

“বাপ রে!” বলে গোবিন্দ ঘোড়ার বেগে দৌড়ে পালাল।

নিতাই ফটিকের দিকে চেয়ে বলল, “কিছু বুঝলি ফটিক?”

“ইঁ। গড়াইযুড়ি গোবিন্দ সাউকে পছন্দ করে না।”

“কিন্তু আমাদের করে।”

ফটিক চোখ বড় বড় করে বলল, “তা বলে কি ভূতের বাড়িতে থাকা ভাল?”

“ভূত যদি ভাল হয় তবে অসুবিধে কী?”

ঠিক এই সময়ে সেই সুজুকে লোকটা ফিরে এসে রাস্তা থেকে হাঁ করে তাদের দিকে চেয়ে বলল, “এ কী! তোমাদের ঘাড় এখনও মটকায়নি!”

নিতাই বলল, “আজ্জে না।”

“বলো কী হে! এই যে দেখলুম গোবিন্দ সাউ ছুটে পালাচ্ছে!

তার মাথায় আলু, গালে চিবি, কপাল থেকে রক্ত গড়াচ্ছে, আর তোমাদের গায়ে যে বড় আঢ়ড়িও পড়েনি! না না, এ গড়াইবুড়ির ভারী অন্যায়। এটা ভারী একচোখে। আজ অবধি কেউ এ-বাড়িতে চুক্তে পারেন, তা জানো? চোরছাচড় অবধি নয়। গড়াইবুড়ির তাড়া খেয়ে সবাইকেই সঁটকাতে হয়েছে। তা হলে তোমাদের বেলায় অন্যরকম নিয়ম হবে কেন? এটা একটা বিচার হল? এতে কি গড়াইবুড়ির ভাল হবে?”

ঠিক এই সময়ে ভেতরের উঠোন থেকে একটা চেলাকাঠ উঠে এসে ধীই করে লোকটার পায়ের গোছে লাগতেই লোকটা “রাম রাম রাম রাম” বলে চেঁচাতে চেঁচাতে জিরাফের মতো লম্বা লম্বা পা ফেলে উপাও হয়ে গেল।

নিতাই দরজাটা বন্ধ করে খিল তুলে দিল। তারপর চোখ বুজে হাতজোড় করে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, “পেয়াম হই গড়াইঠাকুমা। এ পর্যন্ত তো আমাদের দিকটা ভালই দেখলে, বাকি কয়েকটা দিনও একটু দেখো। আতঙ্কের পড়ে তোমার ঘরে চুক্তে পড়েছি ঠাকুমা, কিছু মনে কোরো না।”

নিতাইরের দেখাদেখি ফটিকও একটু লজ্জা-লজ্জা ভাব করে দুইাত জোড় করে কপালে ঠিকিয়ে গড়াইবুড়িকে পেদাম করে বলল, “আমি একটু ভিত্ত মানুষ গড়াইঠাকুমা। ক্ষম করে আবার যাতবিরেতে দেখাটোখা দিয়ে বোসো না। আতে শিলে চমকে হাঁটফেল হয়ে যেতে পারে। এ কথা দেখলে তাতে কালী-সূর্যা কথোপ্য লাগে। শ্রীচরণে পড়ে রইলুম ঠাকুমা, একটু খেয়াল রেখো।”

তারা গাঁয়ের ছেলে খিদে একটু বেশিই। তার ওপর দোগোছের জলবায়ুর গুণ আর কালকের ধকলে দুঁজনেরই খিদে চাগাড় দেওয়ায় মুখোমুখি দুটো খাটিয়ায় বসে তারা নিজেদের পরস্মাকভি

গুনেগৈথে দেখল। মোট ত্রিশ টাকা আছে। এ থেকে ফেরার ট্রেনভাড়া রেখে যা থাকবে তা কহত্ব নয়।

নিতাই বলল, “দ্যাখ যদি কচুরি-জিলাপি বা মঙ্গ-মিঠাই জলখাবার খাই তা হলে এ টাকা ফুস করে ফুলিয়ে যাবে। আর যদি চিড়েগুড় খাই তা হলে কষ্টেস্টে কয়েকমিনি চলতে পারে।”

ফটিক গজীর মুখে বলল, “হা।”

এ সময়ে হঠাৎ ঘরের পাটাটনের ওপর থেকে দূম করে একটা বড়সড় মাটির ঘট মেঝেতে পড়ে ভেঙে গেল। আর রাশিয়াশি খুচরো টুকুপেয়সা বাল্যান করে মেঝেময় ছড়িয়ে পড়ল।

ফটিক চমকে উঠে বলল, “এ কী রে বাবা?”

নিতাই বাবাক হয়ে মেঝের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ফের চোখ বুজে হাতজোড় করে বিড়বিড় করে বলল, “গড়াইঠাকুমা, এ যে বড় বাড়াবাড়ি করে ফেললে! আর জান্মে কি আমরা তোমার সভ্যকারের নাতি ছিলুম?”

ফটিক বলল, “পরের পয়সা নেওয়া কি ঠিক হবে রে নিতাই?”

“পর! পর কোথায়? ঠাকুমা বলে ডেকেই না! গড়াইঠাকুমার টাকা তো আর স্বর্গে যাবে না। নিজের গরজে দিছেন, না নিলে কুপিত হবেন মে।”

“ও বাবা! তা হলে আয় কুড়েই।”

গুনেগৈথে দেখা গেল, মোট তিলশো বাইশ টাকা।

নিতাই বলল, “ওঁ, গড়াইঠাকুমার দেখছি দুরাজ হাত।”

ফটিক ভয়ে ভয়ে বলল, “বড় দরাজ, এতটা কি ভাল? বিশ পঁচিশ টাকা হলেও না হয় কথা ছিল। তা বলে এত?”



ଦୁଇନେ ପଥେ ବେରୋତେଇ କିଛି ଅନ୍ତରୁ ଘଟାଣ ଘଟିଲେ ଲାଗି।
ମୁଖୋଯୁଧ ଯାଇ ସଙ୍ଗେଇ ଦେଖି ହଜେ ଦେଇ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ହାତଜୋଡ଼ କରେ
ତାଦେର ନମକାର କରେ ଟଟ କରେ ରାତର ପାଶେ ସରେ ଯାଇଁ। କେଉ କେଉ
ଗାହପାଳର ଆଡ଼ାଲେ ଲୁକିଲେ ପଡ଼ିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରମତ୍ତପେର କାହିଁଟାର ଏକ
ମହିଳା ବହର ପାଚକେର ଏକଟା ଛେଳେକେ ହାତ ଧରେ ନିଯେ ଯାଇଛିଲ, ତକ
କରେ ମେ ନିଚୁ ହୁଏ ଛେଳୋଟାର ଢାଇଁ ହାତଚାପା ଦିଯେ ବଲଲ, “ଓରେ,
ଓଦେର ଦିକେ ତାକାଦନି, ଶୁଣ କରେ ଫେଲବେ।”

ফটিক বলল, “এসব কী হচ্ছে বল তো !”

ନିତାଇ ମାଥା ନେବେ ସଲଲ, “ଡୁଡ଼ି, ବୋକା ଯାଏଁ ନା ।”

ଆজ কালীমাতা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে ঢুকতেই কালো আৱ মেটাৰতো
মালিক ভাড়াতাড়ি ক্যাশব্যাঙ্গ ছেড়ে উঠে হাতজোড় কৰে বলল,
“আসুন, আসুন” কী সৌভাগ্য। ওরে, হাতলওলা চেয়ারদুটো এগিয়ে
দে।”

ফটিক আর নিতাই একটু মুখ-তাকাতিকি করে লিল, গরম কচুরি আর জিলিপি খাওয়ার পর দাম দিতে যেতেই মালিক জিভ কেটে বলল, “আরে ছিঃ ! দাম কীসেন ? সম্মান দিতে হবে না, বরং গরম সলেশ হয়েজে কাঘেকথন কৰ থায় যান।”

ফটিক মনস্বরে ডাকল, “মিভাই!”

ନିତାଟ୍ ମାଥା ଲେଖି ବଜାର୍: “ଡକ୍ଟର, ଏଥିରେ ବୋଲା ଯାଏଁ ନା ।”

ନେଟ୍‌ବର ରାହିଁର ବାଟିର ସମ୍ମନେ ଦିଯେ ଯୋଗ୍ୟାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆଜି ଭୋଲ୍ପୁରି
ଦରୋଧାନ୍ତା ଅବସି ଅୟାଟେନ୍ଶନ ହେଁ ଦୌଡ଼ାଯ ଏକଟା ଲସା ମିଲିଟାରି
୫୬

স্বালট দিল।

গাঁয়ে চৰু মেৰে যখন তাৰা নুটোবুৰু লঙ্গৰখানায় পেতে চৰুল
তখন দেখানে বেজায় ভিড়, কিন্তু ওই ভিড়ের মধ্যেও তাৰে সবাই
খাতিৰ কৰে পথ তো ছেড়ে দিলাই, তাৰ অপৰ লঙ্গৰখানায়
ম্যানেজাৰমশাই, তাৰে দেখেই শ্ৰদ্ধাপন্তে উচ্চে হাঁকডাক শুন কৰে
দিলেন, “ওৱে ও জগা, শিগগিৰ অপৰৱের ঘৱে জলেৱ ছিটে দিয়ে
দুটো আসন পেতে দে, আৱ ভি আই পি-দেৱ জন্য রাখা কৰ্মসূৰ
থা঳া-গোলাম দেৱ কৰ, ঠাকুৰকে বেঙ্গল ভাজতে বল, আৱ ধি-ঠা
গৱাম দৱে পিতো দেন চৰু না হয়, দেবিস বাবা।”

मिथुन !

~~উল্লেখ~~ বোধা যাচ্ছে না।”

ଦେଇଯେଦେଇୟେ ବୋରୋନୋର ସମୟ ମ୍ୟାନେଜର ହାତ କଲେ ବଲଲେନ, “ରାତେ ଆପନାମେ ଜନ୍ମ ଏକଟୁ ପୋଲା ଓ ଆର କଥା ମାଂସ ହଛେ । ହେଁ ଟେଙ୍କା । ଏକଟୁ ଦେଖିବି—”

“আচ্ছা- আচ্ছা।” বলে দুজনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল।

বাজারের কাছ বরাবর একটা দেৱানগৰৰের পেছন থেকে একটা
লোক ফস করে বেরিয়ে এসে ভারী বিগলিত মুখে সামনে দাঁড়াল,
“পেমাম হই বাবাৰা, দণ্ডবত, তা আপনিই তো ঘোলো নহৰ ফটিক
ধৈৰ বাবা। তাই না?”

ভারী ছেটখাটো চেহারার, ধূতি আর হাফশ্যার্ট পরা লোকটাকে
দেখে ফটিক অবাক হয়ে বলে, “বোলো নম্বৰ হতে যাৰ কোন
দাখিল ? আমি শুধু ফটিক ঘোষণা”

“ତୁ ଦେଖୋ ରାଖା ଭାଲ । ନଇଲେ ଏତ ଫଟିକ ଘୋମେର ସଙ୍ଗେ ଶୁଳିଯେ
ଫେଲିବୁ ଯେ ।”

“আ! আর কিছু বলবেন?”

খুব হেঁ হেঁ করে হেসে হাত-টাত কচলে লোকটা বলে,

“অধমের নাম রসিক বৈরাগী। এই পেমাম জানাতেই আসা। এত বড় দু'জন শুনি এসেছেন গাঁয়ে, পেমাম জানাতে হবে না? তা বাবা, ভূতের মন্ত্র তো দেখলুম আপনাদের জলভাত, আর মারণ-চট্টান-বশীকরণ তো ধরছিই না, ও তো আপনাদের নথি। বলি বাবা, এই বাটি-চালান-হাটি-চালান-নথদপ্পি, ডাকিনী বিদ্যে এসবও কি আসে বাবা?”

ফটিক অবাক হয়ে বলল, “ভূতের মন্ত্র জানি না তো! আর যা যা বললেন সেসবও জানি না।”

“হঁঁ হঁঁ, কী যে বলেন বাবা! বিদ্যে কি লুকোনো যায়? জপবসন্ত হলে কি শুটি লুকোনো যায়? না কি সর্দি লাগলে কাশি লুকোনো যায়? না কি আমাশা হলে বেগ চেপে রাখা যায় বাবা? বিদ্যে হল ওই জিনিস, ও বেরিয়ে পড়বেই। কাল যখন আপনারা গাঁয়ে এসে চুকলেন বাবা, তখনই আমি গদ্দাটা পেরেছিলুম।”

নিতাই অবাক হয়ে বলে, “কীসের গদ্দ?”

“আজ্জে, অনেকটা মাছের চারের গদ্দ। বড় বড় শুনিনের গাঁয়ে থাকে, ওই গদ্দে ভূত-প্রেত-অপদেবতারা সব তক্ষাত যায়। বাতাস শুকে তখনই আমি আমার ছেটি শালাকে ডেকে বলেছিলুম, ওরে রেমো, এই যে দু'জন মানুষ এসে গাঁয়ে চুকল এবং মেরুন তেমন মনিষ্য নয় রে। চেহারা দেখে বোবার জো নেই, কিন্তু ছোট যেমন গাঁয়ের গদ্দ চেপে রাখতে পারে না, শুনিন্নাও তাই।”

ফটিক বলল, “বটে!”

“হঁঁ হঁঁ, যতই নিজেকে লুকিয়ে রাখুন বাবা, বিদ্যে লুকোনোর উপায় নেই। গড়াইবড়ি মরে ইন্তক ও বাড়ির তিসীমানায় কি কেউ যেতে পেরেছে বলুন তো! কত বড় বড় ওস্তাদ, শুনিন, ওবা এসেছে, কেউ পারেনি। চিল পাটকেল খেয়ে সব পালানোর পথ পায় না। আর আপনারা কেমন ছাঁচ হয়ে চুকলেন, আর ফাল হয়ে

বেরিয়ে এলেন, গাঁয়ে আঁচড়টিও পড়ল না, বিদ্যে না থাকলে কি হয় এসব? আমরাও ছেটখাটে বিদ্যের চাষ করি বিনা তাই জানি।”

নিতাই বলল, “তা আপনার কী করা হয়?”

ভাবী লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে ঘাড় চুলকে রসিক বলল, “সে-কথা মুখ ফুটে বলতে লজ্জাই করে বাবা। পেটের দায়ে রাত বিবেতে বেরোতে হয়। ছেটখাটে হাতের কাজ আর কী! তাও কি শান্তি আছে বাবা? সৃষ্টি দারোগা এসে ইন্তক আমাদের ব্যবসাই লাটে উঠবার জোগাড়। কখন যে কেবল রূপ ধরে কোথায় উদয় হবেন তাৰ কেনিয়ে তিক নেই। বোঠিম সেজে, কাপালিক সেজে, পুরুষ সেজে, এমনকী চোর-ভাকাত সেজেও ঘূরে বেড়াচ্ছেন।”

ফটিক বলল, “বটে! দারোগা যে আবার চোর-ভাকাত সেজেও ঘূরে বেড়ায়, এ তো কখনও শুনিন।”

“আর কবেন না বাবা, তাকে জাবুবান বললেও কম কলা হয়, তকে তকে থাকেন, কখন যে ফ্যাক করে কার ঘাড় ধরে তুলে নিয়ে যান, সৌন্দর্যনের বাধের মতো, তার ঠিক নেই। অখণ্ট দেখুন, দু' পা এগিয়ে মনসাপোতার মোড় পেরোলৈই গজপতি দারোগার এলাকা। যেমন তাঁর নাদুসন্দুস চেহারা, তেমনই হাসিখুশি মুখখানি। দেখলেই বুক ঠাণ্ডা হয়। চোর-ভাকাতের মা-বাগ। যা খুশি করুন কেউ ফিরেও তাকাবে না। যত অবিচার সব এই সতীশ দারোগার এলাকায়। এই আমরা দু'-চারজনই মাটি কামড়ে পড়ে আছি, যত বড় কারিগরুরা সব ওই গজপতির এলাকায় গিয়ে সৌন্দিরেছে।”

“তা আপনি যাননি কেন?”

“সেখানে যে বজ্জ বেঁষাদ্বৈ হয়ে যাচ্ছে বাবা! অত কারিগর জুটেছে তো, আমাদের মতো চুনোপুটির সেখানে সুবিধে হচ্ছে না।”

“তা হলে তো আপনার খুব মুশকিল হয়েছে দেখছি।”

“খুব, খুব, দিনকাল মোটে ভাল যাচ্ছে না। এই এখন আপনারা

দুটিতে এসেছেন, যদি মাঝখ-উচ্চান্ব-বশীকরণ দিয়ে সতীশ
দরোগাকে একটু চিট করতে পারেন তা হলে গরিবের বড় উপকার
হয়।”

নিতাই বলল, “সে আর বেশি কথা কী? দেব’খন চিট করে।”

“আর একটা কথা বাবা! দুলুবাবু আপনাদের সঙ্গে একটু দেখা
করতে চান। বড় মনস্তাপে ভুগছেন।”

ফটিক অবৈক হয়ে বলে, “দুলুবাবু কে?”

রসিক হাতজোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলে, “প্রাতঃস্মরণীয়
মানুষ, লোকে বলে এ-তল্লাটের নবীন হড় না কী যেন।”

“রবিনছড় নাকি?”

“আজে, তাই হবে।”

“তা তাঁর মনস্তাপ কীসের?”

“বড় মনস্তাপ! ঘন ঘন দীর্ঘস্থাস ফেলছেন আর বলছেন, ওরে
মহাদেব, তুই এটা কী করলি? চিঠিখানা নিয়ে চলে এলি? আর
অবোধ ছেলে দুটো চিঠিখানা দেখাতে পারেনি বলে কী হেনছাই
না হল!”

ফটিক ফুঁসে উঠে বলল, “মানে! কোন চিঠি?”

“আমি তো অত জানি না বাবা, যা শুনেছি তাই বলছি কী
একখানা চিঠি নাকি আপনাদের কাছ থেকে দুলুবাবুর শাগরেদ
মহাদেব দাস নিয়ে এসেছিল, আর তাতে নাকি আপনাদের বড়
নাঞ্জেহাল হতে হয়েছে।”

“সে তো বটেই! মহাদেব দাস অতি পাজি লোক।”

“আজে, সেই চিঠিখানা দুলুবাবু ফেরত দিতে চান, আমাকে
ডেকে বললেন, ওরে ছেলে দুটোকে সাঁওরের পর একটু আসতে
বলিস তো, ওনের কট দিয়ে আমার বড় পাপ হচ্ছে।”

ফটিক বলে, “তা সাঁওরের পরে কেন, এখনই যাচ্ছি চলুন।”

জিভ কেটে রসিক দাস তাড়াতাড়ি বলল, “দিনমানে তাঁর সুবিধে
নেই কিমা, দিনমানে তিনি গা-চাকা দিয়ে থাকেন।”

“কেন বলুন তো!”

রসিক একটু হেঁঁ হেঁঁ করে হেসে নিল।

ফটিক আর নিতাই মুখ-চাওয়াগায়ি করে নিল। রসিক বৈরাগী
মিটামিট করে চেয়ে বলল, “দিনমানে তাঁরের বাইরে পা দেওয়ার কি
জো আছে তাঁর? অত বড় শূণ্য, চারদিকে এত নামডাক।
লোকে একেবারে থেকে থেবে হী করে চেয়ে থাকে, পারেন ধুলো
নিতে কাঢ়াকাঢ়ি, অটোবোয়ার্কিং চায়।”

“অটোবোয়ার্কিং? না অটোআফ?”

“ওই তল। যাহা বাহাম, তাহা তিপ্পান। আসন কথা হল, দুলুবাবু
যখন দেখন হাঁ বলতে দেখা দেন না। একটু আবত্তালে থেকে নানা
কালকাঠি নাড়াড়া করেন। আমি ওরই শ্রীচরণের আশ্রমে থেকে
তালিম নিছি কিমা।”

ফটিক বলল, “বুকেছি, চিঠিটা আমাদের খুব দরকার। তা
কোথায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে?”

“এই পুরুষিকের রাস্তায় গিয়ে বটতলা থেকে ডাইনে মোড় নিয়ে
দু’ ফার্লিৎ, একখানা শিবমন্দির আছে। সেইখানে তা বাবারা, আমি
সাঁওরের পর এখানে হাজির থাকব’খন, পথ দেখিয়ে নিষে যাব।”

“তা হলে তো খুবই ভাল হয়।”

রসিক বৈরাগী বিদায় নেওয়ার পর নিতাই বলল, “কাঙ্গটা কি
ঠিক হবে রে ফটিক? দুলু গোসাইয়ের কথা যা শুনলুম তাতে খুব
সুবিধের ঠিকছেনা।”

“চিঠিটা যখন ফেরত দিতে চাইছে তখন একবার গিয়ে দেখলে
হয়।”

“চিঠিটা তো রসিকের হাত দিয়েই পাঠাতে পারত।”

ফটিক একটু ভেবে বলে, “তা ঠিক। তবে চিটিটা পেলে পিসির
সঙ্গে দেখাই হয়, নইলে ফিরে দিয়ে বাবাকে কী বলব বল তো!”

এই লোনোমোনো ভাব নিয়েই সঙ্গের পর দু'জনে ফের বাজারের
কাছটায় আগের জাগরণ এসে দাঁড়াল। তারা যে রাতারাতি বিখ্যাত
হয়ে গেছে তা সোকজনের হাবভাব দেখেই বোৰা যাচ্ছিল। তাদের
দেখতে পেলেই মানুষজন তাড়াতাড়ি হাতজোড় করে কপালে
ঠেকিয়ে হেং হেং করে সারে পড়ছে।

“লোকে কি আমাদের একটু ভয়ও পাচ্ছে রে নিতাই?”

“তা পাবে না? ভৃত্যের মস্তুর জানি বৈ।”

“জীবনে কখনও কেউ আমাকে ভয় পায়নি, খাতিরও করেনি।
নিজেকে এখন বেশ কেউকেটা মনে হচ্ছে।”

সঙ্গে গড়িয়ে একটু রাত হওয়ার পর যথন দোকানের ঝাঁপটাপ
বৰ্ক হতে লাগল, লোকজন কামে গেল, তখনই একটা দোকানঘরের
আড়ত থেকে চাপা গলায় ডাক এল, “বাবারা এই ইদিকে আসুন।
বেশি সাড়শব্দ করার দরকার নেই।”

তারা নিঃশব্দে কাঁচ রাস্তাটা ধরে রসিকের পিছু পিছু চলতে
লাগল। কিছুটা যেতেই ঘৰবাড়ি শেষ হয়ে বোগপঞ্জল শুরু হল।
ঝিরিয়ে শব্দ, পাঁচার ডাক আর ঘোর অন্দুকার।

ফটিক বলল, “আর কতদূর, ও রসিকবাবু?”

“এই আর একটু বাবা।”

কম করেও মাইলখানেক রাস্তা পেরিয়ে তারা যেখানে এল সেটা
রীতিমত জঙ্গল। সামনে বিশাল একটা ঘটগাছ।

“এই বটতলা বাবা। এবাবের ডাইনে। চিন্তা নেই, আমার পিছু পিছু
চলে আসুন।”

ডানদিকের বাস্তুর ঢুকতেই ফটিক আর নিতাইয়ের গা ছমছম
করতে লাগল। বিশাল বড় বড় ঝূপসি গাছের ছায়া, দু'ধারে দেড়
৬২

মানুষ সমান উঁচু আগাছার জঙ্গল। পাঁচা ডাকছে, তক্ককের শব্দ
পাওয়া যাচ্ছে। একবার শিয়ালের দৌড়, পায়ের আওয়াজ পাওয়া
গেল। অফকারে হৌচট থেতে হচ্ছে বারবার।

ফটিক ভয়ে ভয়ে বলল, “এ কোথায় আমাদের রসিকবাবু?”

“কোনও ভয় নেই বাবা, এ রাস্তায় আমার দিনে-রেতে
যাতায়াত।”

“আর কতদূর?”

“এই আর একটু।”

নিতাই জিজেস করে, “দুলবাবু লোকটি কেমন বলুন তো।”

“আহা বড় বৃত্তাগ লোক। সব থেকেও কিছু নেই। কপালের
মেঝে ভালায় বালায় ঘুরে জীবন কঢ়চো। অতবড় সম্পত্তি পড়ে
যাচ্ছে, অত চাকা, কিন্তু সেই কার যেন ভাঙ্গা শোলমাছ হাত ফসকে
পালিয়ে গিয়েছিল। দুলবাবুর সেই অবস্থা।”

“তা বিষয়সম্পত্তির কী হল?”

“সে বড় দুঃখের কথা বাবা। তিনি ছিলেন রায়মশাহীয়ের
পুঁথিপুতুর। যেমন-তেমন নয়, লেখাপড়া করা পুঁথিপুতুর। পাঁচ
বছর বয়সে পুঁথিপুতুর হলেন, আর কুড়ি বছর বয়সেই
ত্যাজপুতুর।”

পুঁথিপুতুর শুনে ফটিক চাপা গলায় বলল, “হাঁ রে নিতাই,
নদিয়াদা না এক পুঁথিপুতুর সম্পর্কে সাবধান থাকতে বলেছিল?”

কথাটা শুনতে পেয়ে রসিক থমকাল, “কার কথা বলছেন বাবা?”

নিতাই বলল, “নদিয়া নামে কাউকে চেনেন? আপনাদের
লাইনেরই লোক।”

অবাক গলায় রসিক বলে, “না তো, এ নামে তো কেউ নেই।
কোথায় দেখা হল তার সঙ্গে?”

“কাল রাতে, চতুর্মণপে।”

“চেহারাটা কেমন বাবা?”

“অঙ্ককারে আবছা দেখা। লঙ্ঘাচওড়া বলেই মনে হল।”

রসিক হঠাৎ “দাঁড়ান বাবা, পেছনের দিকটা একটু দেখে আসি”
বলে ফস করে অঙ্ককারে উলটোদিবে মিলিয়ে গেল।

ফটিক চাপা গলায় বলে, “আমার একটু ভয়-ভয় করছে।”

“সে আমারও করছে।”

“পালাবি?”

“এই অঙ্ককারে পালানোও কি সোজা? যদি পালাই তা হলে
ঘটনাটা জানাও হবে না।”

রসিক ফিরে এসে বলল, “চলুন বাবা।”

“পেছনে কী দেখে এলেন?”

“দিনকাল ভাল নয় বাবা, কেউ পিছুটিছু নিয়েছে কিনা সেটাই
একটু দেখে এলুম।”

ফটিক জিজ্ঞেস করে, “আচ্ছা এই রায়মশাইটি কে বলুন তো?”

“আজ্জে নটবর রায়, আপনার পিসেমশাই।”

ফটিক অবাক হয়ে বলে, “তাঁর আবার পুষ্যপূরুণও ছিল নাকি?”

“যে আজ্জে। রায়মশাইয়ের ছেলেগুলে নেই, অগাধ ধনসংপত্তি,
তাই হরিমপুরের আশুব্যাবুর ছেলেকে দস্তক নিয়েছিলেন। তিনিই
দুর্বুরাবু।”

“তা বলে ত্যাজ্ঞপূর্বুর করলেন কেন?”

“সেও দৃঢ়থের কথা বাবা। রায়মশাইয়ের যাইদয়া বলে কিছু
নেই। পনেরো বছর পেলে পুর্ণে তারপর দাঁড়ধাকা দিয়ে বের করে
দিলেন। দোধের মধ্যে দুর্বুরাবু একটু হাতিবাজ ছিলেন আর কী।”

“শুধু সেইজন্যা?”

“যে আজ্জে। কত্ত অবিচার হয়েছে বাবা।”

নিতাই বলল, “আর কত দূর?”



“এসে গেছি বাবা, ওই যে শিবমন্দিরের চূড়ো দেখা যাচ্ছে।”

অঙ্ককারে জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে আবহা আকাশের গায়ে একটা মন্দিরের চূড়া অস্পষ্ট দেখা গোল। মিনিটখানেক হেঁটে তারা মন্দিরের চতুর্থ দুকল। চারদিক সুনসান। কোথাও কোনও আলোর রেশমাত্র নেই।

ফটিক সভয়ে বলল, “কই, কেউ তো কোথাও নেই?”

কেউ জবাব দিল না। কিন্তু বাতাসে খুব মৃদু একটা শব্দ হল যেন। আর তারপরেই কিছু বুকে ওঠার আগেই একটা ভারী লাঠি ফটিকের বাঁ কাঁধে এত জোরে এসে লাগল যে, সর্বাঙ্গে তীব্র ব্যথার একটা বিদ্যুৎভরণ খেলে গেল তার। ঢোকে অঙ্ককার দেখে সে বসে পড়ল। হঠাৎ চারদিক থেকে ঝপঝপ লাঠি নেমে আসছিল।

কিন্তু এতসব লাঠি সেটির মাঝখানে হঠাৎ ফটিকের হাতেও একটা লাঠি কী করে যেন চলে এল। লাঠিটা হাতে পেরেই সে লাফিয়ে উঠে দমাদম চার দিকে লাঠি চালাতে লাগল। জীবনে সে কখনও লাঠিক্ষৰ্ণ করেনি কিন্তু এখন দিয়ি সে পাখসাট মেরে লাঠি চালাচ্ছ দেখে নিজেই ভারী অবাক হয়ে গেল। আরও আচরণে বিষয়, অঙ্ককারে অস্তত দশ-বারোটা লেঠেল তাদের ঘিরে থেকে লাঠি চালাচ্ছ বটে, কিন্তু আর একটাও লাঠি তার শৰীরে লাগছে না, হাতে লাঠি বিদ্যুৎবেগে ঘুরে ঘুরে মার দেকিয়ে দিছে।

ফটিক ডাকল, “নিতাই, ঠিক আছিস?”

নিতাই একটু দূর থেকে বলল, “ঠিক আছি। তোর কী খবর?”

ফটিক বলল, “খবর বেশ ভালই। আমি যে এত ভাল লেঠেল কখনও টের পাইনি তো।”

নিতাই বলল, “আমিও পাইনি। চালিয়ে যা।”

ফটিক লাঠির ঘায়ে একজনকে ধরাশায়ী করে চেঁচিয়ে উঠে নিজেকেই বাহবা দিল, “সাবাস!”

নিতাই বলল, “কী হল রে?”

“একটাকে ফেলেছি।”

নিতাই বলল, “ধূস! আমি তিনটেকে ঘায়েল করলাম।”

ফটিকের ভৱ-ভৱ কেটে গিয়ে ভারী আনন্দ হচ্ছিল। সে গুন গুন করে “দুর্গম গিরি কাস্তার মক...” গাইতে গাইতে আর দুজনকে ধরাশায়ী করে বলে উঠল, “নিতাই তোর কটা হল?”

“এই যে চার নম্বরটাকে ফেলেলাম।”

“চাপিয়ে যা।”

ঠকঠক ঠকঠক লাঠির শব্দ হতে লাগল। সেই সঙ্গে ফটিকের গান আর প্রতিগাফদের মাঝে মাঝে “বাবা রে! মা রে! গেলুম রে!” বলে চিরাব। নিতাইয়ের লাঠি খেয়ে কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, “খুন...খুন করে ফেলল! বাঁচাও...বাঁচাও...”

ফটিক তাছিলোর সঙ্গে বলল, “ঝঃ, সোকগুলো একেবারে আনাড়ি দেখছি।”



কঙ্কাটাদের মুগু না থাকলেও তাদের কোনও অসুবিধে হয় না। শেনা যায় তাদের চোখ নাক কান সবই থাকে তাদের বুকে। বীশবনের দুই কঙ্কাটা দাবা খেলে খেলে ক্লান্ত হয়ে একটু বেড়াতে বেরিয়েছিল। গাছে গাছে মগডাল থেকে মগডালে ঝুল থেয়ে থেয়ে তারা মনসাপোতার জঙ্গলে এসে একটা গাছ থেকে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে জিরোছিল। তখন কঙ্কাটা ক কঙ্কাটা খ-কে বলল, “ওই দ্যাখ, ঝুঁড়ি যাচ্ছে।”

কন্ধকাটা থ বলে, “কার তুঁড়ি?”

“গজপতি দারোগার ভুঁড়ি।”

“তা গজপতি দারোগা কোথায়?”

“ভুঁড়ির পেছনে পেছনে আসছে।”

“ও বাবা, সঙ্কের পর গজপতি দারোগা আজ বেরোল যে! এ তে ঘোর দুর্লক্ষণ? দেশে অনাবৃষ্টি, মহামারী, ভূমিকম্প কিছুনা-কিছু হচ্ছেই।”

“হ্যাঁ সঙ্কের পর গজপতিকে কেউ ঘরের বাইরে দেখেনি বটে। নিশ্চয়ই গুরুতর কারণ আছে।”

“থাকতেই হবে।”

“আয় তবে, মজা দেখি।”

কন্ধকাটা থ হঠাৎ বলল, “ওরে দ্যাখ, দ্যাখ, গড়াইবুড়ি তার বাড়ি ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে!”

কন্ধকাটা ক-ও ভারী অবাক হয়ে গিয়ে বলে, “আঁ! তাই তো! এ যে খুবই অলঙ্কৃত কাণ! দেশে কি শেখে মড়ক লাগবে?”

কন্ধকাটা থ হাঁক দিয়ে বলল, “বলি ও গড়াইবুড়ি, বলি যাণ কোথা?”

গড়াইবুড়ি একটা শিশুল গাছের মগডালে ডান পারের পাতায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে কী দেখছিল, কন্ধকাটাদের দেশে লজ্জা পেয়ে বলল, “পেরাম হই বাবাঠাকুরেৱা। হোড়ানুটোকে খুজছি।”

“কেনেন হোড়ানুটো?”

“আৱ বলবেন না বাবাঠাকুরেৱা, দুটি পুরি এসে জুটেছে। বোকার হন্দ। ডান বীঁ চেনে না। সাঁবৈর পর কোথায় বেঝল। বড় ভাবনা হচ্ছে।”

“ভূমি তো বাপু নিজের বাড়িটি ছেড়ে কখনও নতোনি আজ অবধি।”

“নড়াৱ কি জো আছে বাবা! ও বাড়িৰ ওপৰ যে সবাৱ বড় কুনজৱ। পাহাড়া না দিলেই দখল কৰে নৈবে।”

“শেৱ অবধি কি মায়াৱ বকনো পড়লো নাকি গড়াইবুড়ি! মৱাৱ পৰ কাৰণ কি ও বালাই থাকে?”

একটা দীৰ্ঘধাস হেলে গড়াইবুড়ি বলে, “মে তো আমাৱও ছিল না। ছোড়ানুটোৰ মুখ দেখে কী যে হল কে জানে! বড় ভাবনা হচ্ছে।”

“আহা ওসব হচ্ছে একটা মজা দেখবে এসো। ওই দ্যাখে গজপতি দারোগা কোনো বেরিয়েছে।”

কিন্তু গড়াইবুড়ি দাঢ়াল না। গাছে গাছে ডিং মেৰে হাওয়া হয়ে গৈল।

গধকাটা ক আৱ থ মিলে মজা দেখতে লাগল।

কিন্তু তাৱা মজা পেলো গজপতি দারোগা মোটেই মজা পাচ্ছিলেন না। সঙ্কেৱ পৰ তিনি বাড়িৰ বাইৱে পা দেন না। ভূতপ্রেত, চোৱ-ভাকাত, খুন-গুণা, সাপখোপ ইত্যাদি নানা অস্পত্নিৰ ব্যাপার এই সঙ্কেৱ পৰই মাথাচাড়া দেয়। তাঁৰ বহুকালোৱ অভ্যন্ত হল সঙ্কেৱ পৰ এক বড় বাটি ভৰ্তি কীৰী, দুটি মৰ্মান কলা, একধাম খই দিয়ে মেথে খেয়ে বাটাদেৱ সঙ্গে বসে লুড় খেল। রাতে থানাৰ কাজকৰ্ম সেগাইৱাই সামলায়। আজ তাঁকে বেৰোতে হয়েছে হেড কলন্টেকল রামভূজ পালোয়ানেৱ পাঞ্জাব। এ-কথা ঠিক যে, দোগেছেতে সতীশ দারোগা আসাৱ পৰ থেকেই গজপতিৰ বদনাম হচ্ছে। সতীশ দারোগা নাকি খুবই কৱিৎকৰ্মা, দুর্জয় সাহসী, তাৱ দাপটে নাকি দোগেছেতে চুৱি-ভাকাতি, খুনখারাপি বকন। আৱ গজপতিৰ এলাকায় নাকি অপৰাধপ্ৰবণতা দারুণ বেড়ে যাচ্ছে। শোনা যায় সতীশ দারোগা বহুবৰ্ষী। কখনও পাগল বা সাধু, কখনও বা চোৱ কিংবা ডাকাত সেজে চোৱ-ভাকাতেৱ সঙ্গে ভাব জমিয়ে

তাদের ধরে। এমনকী বাঘ বা গাছ সেজেও নাকি সে জঙ্গলে ঘাপটি মেরে থাকে। প্রায়ই খবর পাওয়া যায় সতীশ আজ চার চোরকে ধরেছে, কিংবা দশ ডাকাতকে। রোজই রামভূজ গজপতিকে এসে বলে, “বড়বাবু, আপনি সতীশ দারোগার চেয়ে কম কীসে? তবু সতীশ দারোগার এত নাম হয়ে যাচ্ছে!”

তবু এককাল গজপতি গা করেননি। কিন্তু আজ রামভূজ যে খবর দিয়েছে তাতে হির থাকা যায় না। রামভূজ বলেছে, বড়বাবু, আপনার নাম ডোবাতে আজ সতীশ দারোগা আপনার এলাকায় তুকে কিন্তু বদমাশকে ধরে নিয়ে যাবে বলে খবর আছে। এতে তো আপনার খুবই বদনাম হবে। আপনার চোর-ডাকাত যদি সতীশ দারোগা ধরে তা হলে তো একদিন আপনার গদিতেই এসে বসে যাবে। আপনাকে হয়তো টুলে বসে থাকতে হবে।

এই কথা শুনে গজপতি হফ্ফার দিয়ে বললেন, “এত সাহস সতীশ দারোগার? আমার চোর-ডাকাত ধরার সে কে? না না, কিছুতেই এই অন্যায় বরদাস্ত করা যায় না।”

রামভূজ বলল, “শাবাশ হজুর! তা হলে আজ সাঁয়োর পর চলুন। পাকা খবর আছে আজ সতীশ দারোগা মনসাপোতার জঙ্গলে তুকবে।”

একটা দীর্ঘসাময়িক ফেলে গজপতি রাজি হলেন।

কিন্তু রাজি হয়ে যে কী ভুলই করেছেন তা এখন পদে পদে বুঝছেন। প্রথম কথা, মনসাপোতার জঙ্গল অতি বিছিরি জায়গা। খানাখন্দে ভরা, কাটাওলা আগাছায় ভর্তি, শেয়াল, পাঁচা, নানারকম জীবজন্মুর আত্মানা, সাপখেশের ভর। তা ছাড়া তিনি ইচ্ছিতে পারেন না তেমন। এই বিছিরি জঙ্গলে ইচ্ছাইটি করতে গিয়ে তিনি হ্যাস্ফাইস করছেন। ঘামে সর্বাঙ্গ ভেজা।

গজপতি বললেন, “এ কোথায় এনে ফেললে হে রামভূজ?”

“চূপ হজুর। বাতাসেরও কান আছে। সতীশ দারোগা যে কোথা দিয়ে কোন ছাঁবিশে তুকবে তার কোনও ঠিক নেই। মনসাপোতার মেঝে আমাদের সেপাইয়া মোতায়েন আছে বটে, কিন্তু তাদের চোখে ধুলো দেওয়া সতীশ দারোগার কাছে জলভাস্ত। বললে বিশ্বাস করবেন না হজুর, আমাদের সেপাই বিরিপি একবার ভুল করে সতীশ দারোগাকে নিজের শ্বশুর ভেবে পেরাম করে ফেলেছিল।”

গজপতি একটা হকার দিলেন, “বটে! তা হলে তো বিরিপিকে বরখাস্ত করা উচিত।”

“সেইজন্তু তো হজুর, আজ আপনাকে নিয়ে এসেছি। আর যার চোখকে ফাঁকি দিক, আপনার চোখকে ফাঁকি দেওয়া তো সোজা নয়।”

গজপতি ঘাড় থেকে একটা শুঁয়োপোকা ফেলে দিয়ে জায়গাটা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, “আমার শ্বশুর সেজে এসে আমাকে ঠেকানো অত সোজা নয়। আমার শ্বশুরকে আমি বিলক্ষণ চিনি। তিনি ফোকলা, টারা, নুলো আর টেকো। কিন্তু কোথায় সেই ব্যাটা?”

“আসবে হজুর, এই পথেই আসবে। একটু নজর রাখুন।”

হঠাৎ গজপতি বলে উঠলেন, “আজ্ঞা গাছের ওপর থেকে কে একজন হেসে উঠল বলো তো।”

রামভূজ বলল, “রাম রাম। আমিও শুনেছি হজুর। ওসব না শেনার ভান করে থাকুন। মনে হচ্ছে বীৰবন্দের কন্ধকটা দুঁজন।”

গজপতি তারস্থরে রামনাম করতে করতে বললেন, “বাড়ি চলো হে রামভূজ...”

“চূপ, চূপ হজুর! কে যেন আসছে।”

জঙ্গলের ‘সৱ’ পথ ধরে একটা ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছিল।

গজপতি এক হাতে পিতল অন্য হাতে টর্চ নিয়ে এগিয়ে গিয়ে বলে

উল্লেন, “না, না সতীশবাবু, কাজটা মোটেই ঠিক হচ্ছে না। এটা আমার এলাকা, আমার আঙ্গিত সব চোর-ভাকাতকে আপনি ধরার কে?”

টর্চ ছেলে যাকে দেখলেন গজপতি তাকে দেখে তিনি স্তুতি। লোকটা দাঢ়ি-গোঁফওলা, ফোকলা, টেকো, ট্যারা এবং বী হাতটা নুলো। লোকটা ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, “গজপতি বাবাজীবন নাকি?”

“এ কী! এ যে শ্বশুরমশাই!” বলে গজপতি দিয়ে তাড়াতাড়ি শ্বশুরমশাইয়ের পারের খুলো নিয়ে একগাল হেসে বললেন, “কখন এসেন?”

“এই সক্ষেপেলাতেই এসেছি বাবা। এসে শুনি তুমি নাকি চোর-ভাকাত ধরতে বেরিয়েছ। কী সাঙ্গাতিক কাণ! এসব কি তোমার সহ্য হয় বাবা? শুনেই তো আমি আর থাকতে না পেরে তোমাকে ঝুঁজতে বেরিয়ে পড়েছি। চোর-ভাকাত যাদের ধরার তারা ধরুক তো। তুমি বাঢ়ি চলো। তোমার জন্য পরোটা আর মাংস রাখা হচ্ছে।”

গজপতি লজ্জার সঙ্গে মৃদু হেসে মাথা নিচু করে বললেন, “ও কিছু নয়। সামান্য কয়েকটা ছিকে চোর আর আনাড়ি ভাকাতরা একটু গুণগোল করছিল। তা বলছেন যখন, চলুন। তইও চলে আয় রে রামভূজ।”

শ্বশুরমশাই বললেন, “চলো বাবা, তুমি আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।”

কয়েক পা যাওয়ার পরই পেছন থেকে রামভূজ বলল, “বড়বাবু, আপনার শ্বশুরমশাই কোথায় গেলেন?”

“তার মানে?”

“তুনি তো বিলকুল গায়েব।”

পেছনে টর্চ ফোকাস করে গজপতি অবাক হয়ে বলেন, “তাই তো। শ্বশুরমশাই গেলেন কোথায়?”

রামভূজ বলে, “উনি মোটেই আপনার শ্বশুরমশাই নন। ওই লোকটাই সতীশ দারোগা।”

“বিলিস কী? দ্যাখ দ্যাখ, কেনদিকে গেল?”

চারদিকে খুঁজেও লোকটাকে খাওয়া গেল না। গজপতি দৃঢ়ে করে বললেন, “একটু সবেচে আমারও হচ্ছিল। লোকটা যেন ঠিক ফোকলা নয়, কালো-কালো দাতের মতো কী যেন দেখা যাচ্ছিল মুখে। আর নুলো ভাবাড়াও যেন ইচ্ছে করে করা। টাকটাও যেন ফেরেন সন্দেহজনক।”

গাজোর গুগর থেকে ফের চাপা হাসির শব্দ শুনে গজপতি কাঁপা চালার বললেন, “কে?”

রামভূজ বলল, “রামনাম করুন বাবু, রামনাম করুন।”

দুঁজনে দৌড়ে খালিক তফাত হলেন। গজপতি হাফাতে বললেন, “রামভূজ, এক রাত্তিরের মতো অনেক হয়েছে বাবা। এবার বাঢ়ি চল।”

“আপনার নাম যে খারাপ হয়ে যাবে বড়বাবু।” এই সময়ে হাঁচাং সামনের দিকে খটাখট করে একটা শব্দ পাওয়া গেল। কে যেন সেইসঙ্গে চঁচিয়ে উঠল, “খুন! খুন করে ফেলল। বাঁচাও...বাঁচাও...”

গজপতিবাবুর হাত-পা কাঁপতে লাগল। ফাঁসফয়াসে গলায় বললেন, “কী, কী হচ্ছে বল তো!”

রামভূজ বলল, “খুনখারাপি কিছু হচ্ছে বলে মনে হয়।”

গজপতিবাবু সবেগে মাথা নেড়ে বললেন, “খুন! কফ্কনো নয়। আমার এলাকায় কশ্মিনকালেও খুনটুন হয় না। যা দু-একটা লাশ পাওয়া যায় সেগুলো সব সতীশ দারোগার এলাকায় খুন করে আমার বদলাম করার জন্য এই এলাকায় ফেলে যায়।”

“তুব ছজুর, আপনিই তো এলাকার দণ্ডমুঞ্চের মালিক। একটু এগিয়ে দেখে আসবেন চুনুন।”

“গাগল নাকি? খুন্টন আমি একদম পছন্দ করি না। চোথের সামনে ওসব দেখলে রাতে আমার খাওয়াই হবে না। ঘুমেরও বারোটা বাজবে। ও খুন্টন নয়, কেউ আমাকে ভয় দেখাতে চাইছে। চল, তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাই।”

হঠাৎ সামনের অঙ্ককার থেকে কে বেন গাঁতির গলায় বলল, “সেটা খুবই কাপুরবের মতো কাজ হবে গজপতিবাবু।”

গজপতি টর্চ ফোকাস করে কাউকেই দেখতে পেলেন না। বললেন, “আপনি কে?”

“সেটা অবাস্তু। দেগেছে থেকে দুটো নিরীহ ছেলেকে ভুলিয়েভালিয়ে ডেকে এনে এখানে খুন করার ব্যবস্থা হয়েছে। অস্তু দশজন লাঠিয়াল তাদের ওপর চড়াও হয়েছে। আর এদের পেছনে কে আছে জানেন? দুলুবাবু। দুলাল রায়।”

“ও বাবা! সে যে সাঙ্গাতিক লোক।”

“হ্যাঁ, খুবই সাঙ্গাতিক লোক। নটবর রায়ের সম্পত্তি থেকে বদ্ধিত হয়ে ওঁর মাথা গরম হয়ে গেছে।”

গজপতি একটু পিছিয়ে গিয়ে বললেন, “তা খুনটা হচ্ছে কেন?”

“কারণটা খুব সোজা। নটবর রায়ের ছেলেপুলে নেই। দুলাল রায়কে পুর্যিপুরুর নিয়েছিলেন, কিন্তু দুলাল বড় হয়ে কুসঙ্গে মিশে উচ্ছমে যায়। পনেরো বছর বয়সেই সে জেল খেটেছে। তাই নটবর রায় তাকে ত্যাজ্যপূর্ত করেন। নটবর রায় অবশ্যে তাঁর স্তৰীর ভাইপোকে সব লিখে দেবেন বলে পায়রাডাঙ্গ থেকে আনিয়েছিলেন।”

ঝুমালে কঢ়ান্তের ঘাম মুছে গজপতি বললেন, “তারপর?”

“খবরটা পেয়েই দুলালবাবু নটবর রায়ের মাথা গুলিয়ে দেওয়ার

জন্য পলেরোজন লোককে পর পর ফটিক ঘোষ সজিয়ে ওঁর কাছে পাঠান। আসল ফটিক ঘোষের কাছ থেকে তার পিসির দেওয়া চিঠিটা লোপট করেন। কিন্তু তাতেও শ্রেষ্ঠতম হবে না বুকে ফটিককে ধরাধাম থেকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। ওই যে লাঠিবাজির শব্দ শুনছেন ওটাই হল সেই আয়োজন। আপনার উচিত ওখানে দিয়ে হাজির হয়ে দুজনকে বাঁচানো।”

“ও বাবা! দুলুবাবুর সঙ্গে কি আমি পেরে উঠবং? দশজন লেঠেলও রয়েছে যে!”

“কিন্তু আপনার কোমরে তো পিস্তলও রয়েছে!”

“পিস্তল? আমি জীবনে কখনও পিস্তল ছুড়িনি। ওর শব্দে আমার পিস্তল চাকে যায় যে!”

“তা হলে দুটো নিরীহ ছেলে কি আপনার চোখের সামনেই মরবে?”

“না, না, চোখের সামনে মরবে কেন? চোখের সামনে তো মরছে না! আমি তো কিছু দেখতেই পাছি না। যা হচ্ছে তা চোখের আড়ালোই তো হচ্ছে।”

একটু হাসির শব্দ শোনা গেল। লোকটা বলল, “তা হলে আপনি সতীশ দারোগাকে টেকা দেবেন কী করেন?”

“ওসব মরাটিরা যে দেখতে আমি পছন্দ করি না। ওসব দেখলে আমার খাওয়ায় অরুচি হয়, ঘুম হতে চায় না। কিন্তু আপনি কে বলুন তো?”

“আমিই সতীশ দারোগা।”

“আঁ! না, না সতীশবাবু, এটা আপনার ঠিক হচ্ছে না। দেশে আইন আছে, নিয়ম আছে, ভদ্রতাৰোধ আছে। আপনি আমার এলাকায় চুকে সেসবই যে লজ্জণ করছেন! এটা কি ভাল হচ্ছে সতীশবাবু?”

“একটু আগেই আপনি আমাকে আপনার শিশুর ভেবে প্রশ্ন করেছেন। যে লোক নিজের শিশুরের সঙ্গে অন্য লোককে গুলিয়ে ফেলে সে অতি অপদর্শ লোক।”

কথটা গজপতি একটু ভেবে দেখলেন। তাঁর মনে হল, সতীশ দারোগা খুব একটা ভুল কথা বলেনি। তিনি একটু ঘাড় চুলকে বললেন, “তা আপনি যখন আমার এলাকায় ঢুকেই পড়েছেন তখন আপনিই বা কেন ছেলে দুটোকে মরতে দিছেন?”

সতীশ দারোগা বলল, “মরতে নিতুম না, যদি না একটা অসুস্থ কাণ দেখতে পেতুম। আপনিও দেখতে পারেন। কেনও ভয় নেই। এগিয়ে আসুন।”

“কিন্তু মরা টুরা—”

“আসুন না। এলেই দেখতে পাবেন।”

“আর রে রামভূজ।” বলে পায়ে পায়ে গজপতি দারোগা এগিয়ে গেলেন। শিবমন্দিরের চাতালে তখন আটটা লোক পড়ে আছে। আর দু’জন মুশকো চেহারার লোক দুটো রোগাভোগ ছেলের সঙ্গে লাঠালাটি করছে। উচ্চের আলো ঝালতেই স্পষ্ট দেখা গেল ছেলে দুটোর হাতে লাঠির বেদম মার খেতে খেতে লোক দুটো ঢেঁকে তারপর দমাস দমাস করে দু’জন পড়ে গেল।”

অফিসের থেকে সতীশ দারোগা বলল, “লড়াই দেখা।”



দোগেছে থানার দারোগার ঘরে বাত দশটির সময় দুশ্টা এরকম: একখানা লম্বা বেঁকের একধারে বাইর ছাবিশ-সাতাশ বয়সের একজন লোক ঘাড় এলিয়ে বসে আছে। বেশ তাকতওয়ালা চেহারা, তবে এখন তাৰ মাথা কেটে জামা রক্তে ভেজা, বাঁ হাতটা ভাঙা বলে কেন কেনে একটা ন্যাকভাড়া দিয়ে গলার সঙ্গে ঝোলানো। ইনিই দুলোল রায়। মাকে মাকে বিড়বিড় করে বলছেন, দেখে নেব, দেখে নেব, তবে গলার স্বর ভাল ফুটছে না। তাঁর বাঁ পাশে জনাচারেক লেটেল বসে “উঃ আঃ বাবা রে মা রে” বলে কাতরাচ্ছে। সকলেরই গায়ে কালশিটে, মাথা ফাটা বা হাত-পা ভাঙা। কয়েকজন মেঝেতে অঞ্জন হয়ে পড়ে আছে। তাদের পাশেই হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে দড়িতে বাঁধা রসিক বৈরাগী।

দারোগার উলটোদিকে নটবৰ রায়, তাঁর পাশে বঙ্গসুন্দরী দেবী, তাঁর পাশে ফটিক ঘোষ, তাঁর পাশে নিতাই, নিতাইয়ের পাশে গজপতিরাবু। বঙ্গসুন্দরী দেবী ফটিকের পিঠে হাত বোলাতে-বোলাতে হাপুস নয়নে কাঁদছেন। দারোগাবাবু তাঁর দিকে একখানা পোস্টকার্ডের চিঠি এগিয়ে দিয়ে বললেন, “এই আপনার সেই চিঠি।”

বঙ্গসুন্দরী বললেন, “ও চিঠির আর দরকার নেই। ফটিক আমার দাদার লেখা যে চিঠি ওর পিসেমশাইয়ের হাতে দিয়ে যায় সেইটে পড়েই বুঝতে পারি যে, এই আমার আসল ফটিক। চিঠিতে দাদা আমাকে পাঠ লিখেছিল ‘য়েহের কুন’ বলে। কুন নামে একমাত্র

দাদাই আমাকে ডাকত, আর সবাই ডাকত পুতুল বলে। ওই চিঠি
পড়েই আমি ওঁকে বলি, ওগো, এই ছেলেটাই আমার ফটিক।”

হাত্তাৎ নটবর রায় বললেন, “ফটিক আর নিতাই দু'জনই আমার
কাছে থাকবে। ফটিক সম্পত্তি পাবে, নিতাইকে ম্যানেজার করে
দেব। কিন্তু দুলু কোনও গণগোল করবে না তো সতীশবাবু?”

সতীশ মাথা নেড়ে বললেন, “না, দুলুবাবুর বিকাশে চারটে
প্রমাণিত খনের মামলা আছে। আর আজকেরটা নিয়ে আছে তিনটে
খনের চেষ্টার অভিযোগ। ফাঁসির দড়ি ওর কপালে নাচছে।”

সতীশ দারোগা ফটিক আর নিতাইয়ের দিকে ঢেয়ে বললেন,
“তোমরা লাঠিখেলা কোথায় শিখেন?”

ফটিক আর নিতাই মুখ চাওয়াওয়ি করে নিল। ফটিক বলল,
“জীবনে কখনও লাঠিখেলা শিখিনি।”

“তা হলে কী করে এসব হল? দশ-বারোজন লেঠেলের সঙ্গে
লড়লে কী করে?”

নিতাই চাপা গলায় বলল, “গড়াইঠাকুমা।”

সতীশ দারোগা মুদ্র হেসে বললেন, “আমারও তাই মনে
হয়েছিল।”

ফটিক বলে ওঠে, “কিন্তু আপনি সতীশ দারোগা হলেও আপনি
কিন্তু আমাদের ননিয়াদা।”

সতীশ দারোগা হেসে বললেন, “হ্যাঁ, কখনও আমি ননিয়া চোর,
কখনও গজপতিবাবুর ষষ্ঠুর, কখনও বাদু, কখনও সাধু। কত কী যে
হতে হয় আমাকে!”

গজপতিবাবু তাড়াতাড়ি উঠে বললেন, “আপনি আমার ষষ্ঠুর নন
ঠিকই। কিন্তু তাকে কোথা দিন তো মশাই, আর-একবার পায়ের ধূলো
দিন।”



A>B

For More Bangla E-Books Visit

www.banglabookpdf.blogspot.com

